প্রযুক্তি কথন

একটি আমাদের প্রযুক্তি প্রকাশনা

সেপ্টেম্বর, ২০০৯

প্রযুক্তিকথন

সেপ্টেম্বর ২০০৯ সংখ্যা

একটি আমাদের প্রযুক্তি প্রকাশনা

প্রযুক্তি কথন

বর্ষ ২, সংখ্যা ১ | জ্বালানি এবং পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রকাশক
আমাদের প্রযুক্তি টিম

এ সংখ্যার সম্পাদক
কারিগর হাসান

সম্পাদনা সহযোগী
শাহরিয়ার তারিক
বিপ্র রঞ্জন ধর
সবুজ কুমার কুন্ডু
শাবাব মুস্তাফা

লাইসেন্স

সৃজনী সাধারন লাইসেন্স ৩.০ এর আওতায় প্রকাশিত।
সাময়িকীটি যেকোন ধরনের অবাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার ও বিতরণ করা যাবে।
সকল লেখার স্বত্ব লেখকের, কোন লেখা অন্য কোন মাধ্যমে পুনঃপ্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট লেখকের নির্ধারিত লাইসেন্স অনুসরন বা অনুমতি নিতে হবে।

উৎসর্গ

একুশ শতকের সেই সকল ভাষা সৈনিকদের প্রতি যারা শত প্রতিবন্ধকতার মাঝেও বাংলা কম্পিউটিংয়ের প্রসারের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন!

সম্পাদকীয়

বর্তমান যুগের প্রযুক্তি নির্ভর জীবন যাপন এবং আমাদের অবিরাম ছুটে চলার তাগিদে আমরা প্রায়-ই ভুলে যাই আমাদের অতি আপন, খুব বেশি জরুরী পরিবেশ এর কথা। একটা সময় ছিল যখন খোকা-খুকুরা বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী কিংবা ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখে বড় হত। এখন খানিকটা বদলেছে প্রেক্ষাপট। অনেকেই সফটওয়্যার নির্মাতা বা দ্রুত গতির গাড়ি বা মহাকাশ যানের নির্মাতা হবার স্বপ্ন দেখে বড় হচ্ছে।

অথচ যুগের পর যুগ ধরে আমরা নিজেরা যেই পরিবেশের অংশ সে পরিবেশ নিয়ে ভাবনা আমাদের ভাবনার অতলেই থেকে গেছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে, আমাদের আধুনিক জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ জ্বালানি-শক্তি। আমাদের এই বিলাসী জীবনের কি প্রভাব পড়ছে আমাদের পরিবেশে অথবা, কোথা থেকেই বা এলো এই জ্বালানি? এই সব ছোট-বড় ভাবনা গুলো নিয়েই, মূলত এক ঝাঁক তরুণ লেখকের কিছু রচনার সংকলিত প্রকাশ এবারের প্রযুক্তি কথন।

তবে, কেবল জ্বালানি বা পরিবেশ-ই নয়, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, সফটওয়্যার পরিচিতি এবং কম্পিউটিং এর নানা কলাকৌশলের পাশাপাশি থাকছে অন্যান্য নিয়মিত বিষয়।

সূ চি প ত্র

শক্তির উৎস, কিছু প্রাক- কথন ৮
পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রভাব ১২
অপরিকল্পিত নগরায়ন, পরিবেশ দূষণ এবং আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ১৯
“গ্রাম্য চাষা”- দের বিদ্যুৎ উৎপাদনের গল্প ৪৯
জৈব জ্বালানী: সম্ভাবনা, নাকি সংকট? ৫৪
কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষণ - আগামী দিনের সৌরকোষ! ৫৯
মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ – আমাদের করণীয় কী হবে? ৬২
ইন্টারনেট প্রজন্ম ৬৫
ওয়্যার হাউস এপ. ৬৮
গিট: অসাধারণ একটি সোর্স কোড ম্যানেজমেন্ট টুল ৭১
উইন্ডোজ সার্ভার ২০০০/২০০৩ - এ এক্টিভ ডিরেক্টরি. ৭৭
উবুন্টু যে কারণে উইন্ডোজ নয় ৮১
পথচারী ৮৭

[গোড়ার কথা]

শক্তির উৎস, কিছু প্রাক-কথন

শাহরিয়ার তারিক

আমরা প্রতি নিয়তই শক্তি ব্যবহার করে বাতি জ্বালাচ্ছি, অথবা খাবার রান্না করছি, শক্তি ব্যয় করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাচ্ছি। শক্তির মাধ্যমে আমরা ঘর গরম রাখছি। আমি এই যে কম্পিউটারে বসে এই লেখাটি লিখছি এখানেও কিন্তু শক্তি ব্যবহার হচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে আসে পাশে যাই ঘটতে দেখি তার পিছে মূল হচ্ছে শক্তি।

শক্তির কোন ক্ষয় নেই বিনাশ নেই, কেবল এক রূপ থেকে আরেক রূপে পরিবর্তীত হয়। আমাদের এই মহাবিশ্ব তৈরির সময় যে শক্তি পৃথিবীতে ছিলো সেই একই শক্তি আজও আছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন যে, আমরা যখন জ্বালানি খরচ বাঁচাতে গাড়িকে প্রাকৃতিক গ্যাসে চালাবার উপযোগী করতে ব্যস্ত, যখন বৈদ্যুতিক বাতি-পাখা বন্ধ রেখে শক্তির সাশ্রয়ের নিত্য নতুন উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন আমি কিনা বলে চলেছি যে, শক্তি একই পরিমাণে আছে প্রতিদিন! হ্যাঁ আসলে একই পরিমাণে আছে। কেবল সেই শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যাচ্ছে, যে শক্তিকে আবার পুনরায় ব্যবহার কষ্টকর। তাই শক্তি সীমিত নয় বরং শক্তির উৎস সীমিত। একারণেই প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে শক্তির নতুন উৎস আবিস্কারের, যেই শক্তির উৎস বার বার শক্তি সংরক্ষণ ও সরবরাহে সক্ষম হবে।

শক্তির উৎসও বিভিন্ন রকম দেখা যায়। মানব সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে শক্তি সংরক্ষন করেছে, ব্যবহার করেছে। পেশী শক্তি, প্রাকৃতিক তাপ শক্তি, জৈব জ্বালানী, কাঠ-কয়লা-তেল, পানি/বায়ু প্রবাহ শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, নিউক্লিয়ার শক্তি প্রভৃতি।

শুরুতে সকল শক্তির উৎস ছিলো পেশী শক্তি। নিজ পেশী শক্তি অথবা পোষ্য প্রানীর পেশী শক্তি ব্যবহার করে কৃষিকাজ থেকে শুরু করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়া আসা করতো মানুষ। এছাড়াও শক্তির সুবিশাল উৎস হিসেবে বরাবরই সূর্য আছে। সভ্যতার শুরু থেকেই সূর্যের আলো ও তাপ শক্তি ব্যবহার করা হতো কৃষিকাজ থেকে শুরু করে রান্না করা পর্যন্ত।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ শতাব্দীতেও গ্রীক সভ্যতায় সূর্যের রশ্মীকে কাজে লাগিয়ে ঘর আলোকিত করা, আগুন জ্বালানো থেকে ঘর গরম করা হতো। এখনও সূর্যের তাপ কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে গ্রীন হাউজে শাকসব্জী উৎপাদন করা হচ্ছে। (নোট: সৌর শক্তি ইঞ্জিন: আবিস্কার হয় ১৮৬০ সালে ফ্রান্সে কয়লার স্টিম ইঞ্জিনের বিকল্প হিসেবে।, সৌর ইঞ্জিন শক্তিকে বাষ্পীয় শক্তিতে রূপান্তর করে স্টিম ইঞ্জিন চালানোর জন্য)

আমরা জানি ভূমন্ডলের তাপমাত্রা শুরুতে কিছুটা উষ্ণ ছিলো। ঝর্ণা নদীর উষ্ণ পানি ব্যবহার করে রান্না কাপড় ধোয়া গোসল সবই করতো। ১০ হাজার বছর পূর্বেও উত্তর আমেরিকার পালিও-ইন্ডিয়ান আদিবাসীরা গরম পানির ঝর্ণার উপর নির্ভরশীল ছিলো। আর এখন ভূগর্ভস্থ তাপমাত্রা ব্যবহার করে পাওয়ার প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

প্রায় ১৫লক্ষ বছরের আগে আগুন আবিস্কার করার পর থেকেই মানুষ রান্না ও আত্মরক্ষার কাজে আগুন ব্যবহার করে এসেছে। জ্বালানী হিসেবে মূলত গাছের ডাল পালাই ব্যবহার করে আসতো মানুষ।

কাপ্তাই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথা আমরা এতো শুনি, সেই জল প্রবাহ শক্তিকে কাজে লাগানো কিন্তু আজকের চিন্তাভাবনা নয়। জলের স্রোতের উপর ভরসা করে নৌযান তৈরি করে পারাপার হয়েছে, তেরো নদী সাত সমুদ্র পাড় করেছে মানুষ।

ইতিহাসের পাতায় আমরা যেমন পড়ছি খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে বায়ু শক্তির উপর নির্ভর করে পলিনেশিয়া সভ্যতায় বড় জাহাজ ভাসানো হয়েছে অথবা খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের দিকে উইন্ডমিল, এবং ওয়াটার উইল ব্যবহার করে শস্যদানা ভাঙ্গার যন্ত্র চালিয়েছে। তেমনই আধুনিক সভ্যতার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উইন্ডমিল ও ওয়াটার উইলের ব্যবহার দেখতে পারছি।

এছাড়া শক্তির উৎস হিসেবে তো বহুল ব্যবহৃত জৈবিক জ্বালানী আছেই। কয়লা, গ্যাস, তেল প্রভৃতি জৈবিক জ্বালানীই কিন্তু সিংহভাগ শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে হাজার বছর ধরে। কেবল কয়লা, গ্যাস-তেলই নয় গাছ/ডালপালা, কাঠ, জৈবিক বর্জ্য প্রভৃতি জৈব উৎস তো ১৫০ বছর আগেও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কয়লার প্রথম ব্যবহার দেখা যায় চীনে প্রায় ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে। তখন তারা কয়লাকে জ্বালানো যায় এমন এক পাথর মনে করে ঘর গরম এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করতো।

১২৭৫ সালে মার্কো পোলো যখন চীন পরিভ্রমণ করেন তখন কয়লার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনিই প্রথম ইউরোপে কয়লার প্রচলন ঘটান। কিন্তু তারও বহুবছর পর পর্যন্ত কয়লার সীমিত ব্যবহার ছিলো, এরপর ১৬৯৮ সালে স্টিম ইঞ্জিন আবিস্কার, ১৭৮০এর দিকে স্টিম ইঞ্জিনে পরিবর্তনের দরুণ শিল্পবিপ্লব সহজলভ্য জ্বালানী হিসেবে কয়লার প্রচলণ বহুগুন বেড়ে যায়। (নোট: প্রথম স্টিম ইঞ্জিন কিন্তু আবিস্কার হয়েছিলো কয়লা খনি থেকে পানি সরানো ও কয়লা তুলে আনার জন্য) এরপরেই আসে শক্তির উৎস হিসেবে তেলের কথা। যদিও জ্বালানী হিসেবে তেলের ব্যবহারের কথা প্রথম দেখা যায় জার্মানীতে ১৫৪৬ সালে, বানিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন ও ব্যবহারের কোন উপায় পাওয়া যাচ্ছিলো না। কিন্তু শিল্প বিপ্লব

এবং আরও সহজলভ্য উন্নত/ জ্বালানী অনুসন্ধান হিসেবে তেল উত্তোলন পদ্ধতি আবিস্কার করা হয় ১৮৫৯ সালে। এরপর থেকে কয়লার পাশাপাশি জ্বালানী শক্তির উৎস হিসেবে তেলের প্রচলন বহুগুন বাড়তে থাকে।

শক্তির উৎস হিসেবে বিদ্যুতের কথা না বললে কী চলে। আজ থেকে প্রায় ২৫০০ সাল পূর্বে স্থির বিদ্যুতের আবিস্কার হলেও শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার সম্ভব হয়নি যতদিন না ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ভোল্টাইক পাইল (Voltaic Pile) আবিস্কারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ধারন করার একটি ব্যবস্থা পাওয়া যায় এবং ম্যাকানিকাল অথবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়।

আর পৃথিবীর ১৫% বিদ্যুতের এবং ৬.৫% শক্তির উৎস যে পারমানবিক চুল্লী তা নিয়ে তো কিছু বলতেই হয়। প্রথম নিউক্লিয়ার ফিশন (Nuclear Fission) ঘটানো হয় ১৯৩৪ সালে নিউট্রন ও ইউরেনিয়ামের সংঘর্ষ ঘটিয়ে। এরপর বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহোতে অবস্থিত পরীক্ষামূলক পারমানবিক চুল্লী থেকে শক্তি/ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয় ১৯৫১ সালে । এরপর প্রথম বাণিজ্যিকভাবে পারমানবিক চুল্লী থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয় যুক্তরাজ্যের কলডার হল পারমানবিক চুল্লীতে (এই চুল্লী সামরিক অস্ত্রের জন্য প্লুটোনিয়াম এবং বেসামরিক বিদ্যুৎ সরবরাহ উভয় কাজেই ব্যবহারের জন্য নির্মান শুরু হয় ১৯৫৩ সালে, এরপর ধ্বংস করে ফেলা হয় ২০০৭ সালে) । ২০০৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা বিশ্বে ৪২৯টি পারমানবিক চুল্লী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

কিন্তু এখানেই থেমে থাকা নয়। সহজলভ্য, নিরাপদ এবং স্বল্পমূল্যের বিকল্প জ্বালানীর উৎস খোঁজার কাজ বরাবরই চলে এসেছে। বিশেষ করে ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালের জ্বালানী সংকট এবং জৈবিক জ্বলানীর অনবয়ানযোগ্যতা, বিকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের প্রয়োজনীয়তা বহুগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। এরই ফলপ্রসূতিতে বায়োডিজেল, বায়োম্যাস, বায়োগ্যাস, হাইড্রোজেন সেল প্রভৃতি বিকল্প শক্তির উৎস নিয়ে জোড়েসোরে গবেষণা চলছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে নতুন কোন শক্তির উৎস আমরা পাবো যা আমাদের সকলের জীবনযাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন আনবে। নতুন প্রযুক্তি নতুন বিপ্লবের সূচনা করবে।

ততোদিন পর্যন্ত শক্তির সাশ্রয় করুন, এবং ভালো থাকুন।

লিখেছেন শাহরিয়ার তারিক
একজন প্রযুক্তি মনস্ক ছাত্র

[মূল রচনা]

পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রভাব

মিয়া মোহাম্মদ হুসাইনুজ্জামান

বিদ্যুতের সহজপ্রাপ্যতা বর্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রাণসঞ্চারক। মানব সভ্যতার প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই বিদ্যুৎছাড়া অচল। সভ্যতার প্রয়োজনে তাই বিদ্যুৎউৎপাদন অপরিহার্য। কিন্তু এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে সেটা পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হলে সেটা দীর্ঘমেয়াদে সভ্যতার জন্য উপকারী ভূমিকা রাখতে পারবে না। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সুবিধার্থে পরিবেশের উপরে বিদ্যুৎউৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রভাবের খুটিনাটি জেনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে পরিবেশের উপরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির প্রভাবগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পরিবেশ বলতে মূলত বাস্তুতন্ত্রকে (Ecology) বুঝানো হয়েছে। পরিবেশের অন্যান্য অংশসমূহ, যথা: সামাজিক, রাজনৈতীক, অর্থনৈতীক, নান্দনিকতা ইত্যাদিকে এই বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই বিশ্লেষণে গৃহে ব্যবহৃত খুব ছোট ছোট বিদ্যুৎউৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে বিবেচনায় আনা হয়নি। বিদ্যুৎউৎপাদন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি/ পদ্ধতিগুলো আলোচনায় স্থান পেয়েছে তা হল:

১. জীবাশ্ম জ্বালানী দহন করে বিদ্যুৎউৎপাদন
২. জলবিদ্যুৎ
৩. বায়ুশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎউৎপাদন
৪. জোয়ার- ভাটার শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎউৎপাদন
৫. সৌরবিদ্যুৎ
৬. আনবিক চুল্লীর দ্বারা বিদ্যুৎউৎপাদন
৭. ভূ- গর্ভস্থ তাপের সাহায্যে বিদ্যুৎউৎপাদন
৮. নেগাওয়াট পদ্ধতি (বিদ্যুৎসাশ্রয়)

১. *জীবাশ্ম জ্বালানী দহনের ফলে বায়ু দূষণ*

অধুনা বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানী পুড়িয়ে বেশিরভাগ বিদ্যুৎউৎপাদন করা হয়। এই কাজে জ্বালানী পুড়িয়ে পানি থেকে বাষ্প উৎপন্ন করা হয় এবং সেই বাষ্প দিয়ে স্টীম টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎউৎপাদনের জেনারেটর চালানো হয়।

<u>পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য</u>

সহজলভ্য: জীবাশ্ম জ্বালানী গুলো সহজেই পরিবহন করা সম্ভব বলে এই পদ্ধতিতে যেখানে দরকার সেখানে বিদ্যুৎউৎপাদন করা যায়। এছাড়া যানবাহনের জন্য জ্বালানী পরিবহন ও সংগ্রহের অবকাঠামোগুলোও এটার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

মজুদের সীমাবদ্ধতা: পৃথিবীতে এই জীবাশ্ম জ্বালানীর বিশাল সরবরাহ বিদ্যমান, যদিও এগুলো অসীম নয় বরং নির্দিষ্ট সময় পরে এগুলো শেষ হয়ে যাবে। এটাকে টেকসই করার জন্য প্রতিনিয়তই নতুন নতুন তেলের মজুদ খুঁজে বের করতে হবে যা এককথায় অসম্ভব। কাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে এমন একটা জ্বালানীর উপরে নির্ভর করাটা এই বিদ্যুৎউৎপাদন পদ্ধতির জন্য একটি বড় হুমকি।

ইদানিং অবশ্য জৈব জ্বালানী ব্যবহার করে বিদ্যুৎউৎপাদন শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতিতে জৈব পদার্থকে গাঁজিয়ে সেখান থেকে ইথানল উৎপাদন করা হয় যা জ্বালানী হিসেবে পুড়ানো হয়। এই পদ্ধতিতে মজুদের সীমাবদ্ধতার অসুবিধা অনেকাংশেই দুর হয়।

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া: জ্বালানীর পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ছাড়াও এ পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় হুমকি হল জ্বালানী পুড়ানোর ফলে এ থেকে নির্গত গ্যাসের বায়ু দূষণ। জীবাশ্ম জ্বালানীতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন রয়েছে যা পুড়ানোর ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় - যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির জন্য দায়ী একটি গ্রীনহাউজ গ্যাস। কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির সাথে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সম্পর্কের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকগণ একমত হলেও জীবাশ্ম জ্বালানীর উৎপাদকগণ এটার বিরূদ্ধে প্রচারণাতে এবং এটা মিথ্যা প্রমাণ করতে খুবই সক্রিয়।

জীবাশ্ম জ্বালানীর বদলে জৈব জ্বালানী ব্যবহার করলে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী গ্যাসের নির্গমন কমে যায়। এছাড়া জৈব পদার্থ উৎপাদনের সময় সেগুলোও নিজেদের শ্বসনের প্রয়োজনে বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে ব্যবহার করে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

এছাড়া জৈব পদার্থগুলো পচনের ফলে প্রকৃতিতে যে মিথেন গ্যাস নির্গত হত সেটা না হয়ে গ্যাসটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয় বলে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রোধে এটা ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য যে, মিথেন গ্যাস পুড়ানোর ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় যা মিথেনের তুলনায় ত্রিশ ভাগের একভাগ গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বায়ুদূষণকারী পদার্থ: জ্বালানী এবং দহন প্রক্রিয়ার প্রকারভেদে এ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়াও বিভিন্ন রকম দূষণ হতে পারে। মাঝে মাঝে এ থেকে ওজোন, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং অন্য গ্যাস নির্গত হয়, এছাড়া কণাকার/দানাদার পদার্থও উৎপন্ন হয়। সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলো ধোঁয়াশা (smog) ও অম্লবৃষ্টির (acid rain) জন্য দায়ী। অতীতে এই ধরণের সমস্যাগুলো দূর

করার জন্য কারখানার মালিকেরা ধোঁয়া/ গ্যাস নির্গমনের জন্য উঁচু উঁচু চিমনী তৈরী করতেন। এতে দূষনকারী পদার্থগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এর ঘনত্ব কমে যেত। এই পদ্ধতিতে স্থানীয় দূষণ কমানো গেলেও সার্বিক ভাবে পৃথিবীর দূষণ বৃদ্ধি পায়।

তেজস্ক্রিয়তা: জীবাশ্ম জ্বালানীগুলোর মধ্যে, বিশেষত কয়লার মধ্যে অল্প পরিমানে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। কাজেই প্রচুর পরিমানে এগুলো পুড়ালে এগুলো স্থানীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে তেজস্ক্রিয় দূষণ ঘটায়। এই দূষণের পরিমাণ সাধারণত নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন বা তেজস্ক্রিয় বিদ্যুৎউৎপাদন কেন্দ্রের চেয়ে বেশি হয়, কারণ তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রগুলোতে তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানো রোধে বিভিন্ন সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে।

পারদ দূষণ: এছাড়াও কয়লাতে সামান্য পরিমানে পারদ বা আর্সেনিকের মত বিষাক্ত খনিজ পদার্থ (toxic heavy metal) থাকে। বিদ্যুৎউৎপাদন কেন্দ্রের বয়লারে পুড়ানো কয়লা থেকে বাষ্পীভূত পারদ বাতাসে ভেসে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষের ক্রিয়াকর্মের কারণে অন্য যে সকল উৎস থেকে পারদ ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোতে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়ার কারণে দূষণ কম হয় এবং সেই কারণে মোট পারদ দূষণের সিংহভাগ আসে বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লা থেকে ছড়ানো পারদ বাষ্প থেকে। এই দূষণ কমানোর জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের নকশায় দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা সংযোজন করা যায়।

খনিজ কয়লা আহরণজনিত ক্ষতি: যুক্তরাষ্ট্রে ওপেন মাইনিং পদ্ধতিতে কয়লা আহরণ করা হয়। এতে পাহাড়ের নিচে থাকা কয়লা আহরণের জন্য এর উপরের অংশ কেটে/ বিস্ফোরকের সাহায্যে সরিয়ে ফেলা হয়। বর্জ্য আকরিকগুলো খোলা অবস্থায় পড়ে থাকে এবং এ থেকে পানি চুইয়ে উৎপন্ন সালফিউরিক এসিড আশেপাশের জলাশয়ে প্রবাহিত হয় এবং এর ফলে সেখানকার সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে মৃত্যুবরণ করে।

২. *জলবিদ্যুৎ*

জলবিদ্যুৎতৈরীর জন্য সাধারণত পাহাড়ী এলাকায় বাঁধ দিয়ে বিরাট এলাকায় পানি জমানো হয়। পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে সেই পানির স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে, পানির ধারা দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎউৎপাদন করা হয়।

<u>পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য</u>

জলমগ্নতা: ফলে বিরাট এলাকা ডুবে যায় যেটা পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ঐ এলাকার স্বাভাবিক জৈববৈচিত্র নষ্ট হয়ে জলাভূমির জীববৈচিত্র সৃষ্টি হয়।

জলমগ্নতার জন্য শুধু জীববৈচিত্রই নয়, মানুষের আবাসস্থলও হারাতে হয়। যেটা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎপ্রকল্প এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ভূ- গর্ভস্থ চাপের সাম্যাবস্থা: বাঁধ দিয়ে আটকানো পানির ওজন ঐ এলাকার মাটিস্তরের উপরে চাপ বাড়িয়ে দেয়। ফলে ঐ এলাকায় ভূগর্ভে চাপের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে পড়ে চ্যুতি বা ফাটলের সৃষ্টি করতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন: পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয় বলে বাঁধের উজানে জমা পানিতে দ্রবিভূত অক্সিজেন গ্যাসের পরিমান কমে যায়। ফলে সেখানকার নতুন সৃষ্ট জলজ জীববৈচিত্রও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমানের তুলনায় এর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পরিবেশের পরিমান অনেক বেশি।

৩. বায়ুশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎউৎপাদন

পৃথিবীর পৃষ্ঠদিয়ে সমভাবে চলমান বায়ুপ্রবাহ থেকে যান্ত্রিক শক্তি আদায় করা যায়। মোটামুটি উচ্চ বায়ুপ্রবাহ আছে এমন জায়গায় বিস্তৃত জায়গা জুড়ে বায়ুচালিত টার্বাইন স্থাপন করে বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অতীতের বায়ুবিদ্যুৎটার্বাইনগুলো অল্প এলাকায় ঘণ করে স্থাপন করা হত; এগুলোআকারে ছোট হত এবং প্রচুর শব্দদূষণ করতো। এই কারণে পুরানা বায়ুবিদ্যুৎটার্বাইনগুলো স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তেমন আকর্ষনীয় হয় নাই।

এই টার্বাইনগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে প্রায়শঃই এর পাখার আঘাতে পাখির মৃত্যু ঘটে।

প্রবাহের শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের ফলে টার্বাইন এলাকার ভাটিতে অবস্থিত এলাকায় স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ কমে যায়।

আধুনিক বৃহদাকার টার্বাইনগুলো উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলো অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে এবং বাণিজ্যিকভাবে সফল শক্তির উৎস হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু এলাকায় যেখানে যথেষ্ঠ বায়ু প্রবাহ আছে এবং বিদ্যুতের দাম বেশি সেখানে গৃহে ব্যবহার যোগ্য ছোট বায়ুবিদ্যুৎটার্বাইন স্থাপন করে বিদ্যুৎব্যবহারের খরচ কমানো সম্ভব।

বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে একটা স্থানের নৈসর্গ নষ্ট হতে পারে। তাই নান্দনিক পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এর নকশা সতর্কতার সাথে করা উচিত।

কৃষিপ্রধান এলাকায় স্থাপিত আধুনিক বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র, বিদ্যুৎউৎপাদনের অন্য পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব। কারণ:
পূর্ণব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎউৎপাদনে এ পদ্ধতিতে গড়ে কম স্থান ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে এগুলো অবশ্য বাড়ীর ছাদে অবস্থিত সৌরবিদ্যুৎউৎপাদকের সাথে তুলনীয়, কারণ এই টাওয়ারগুলোর নিচেও ফসল উৎপাদন এবং গবাদিপশুচারণ করা যায়।

এধরণের স্থাপনার খরচ কয়েকমাসের উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্যের সমতূল্য। স্থাপনা তৈরীর সময় গ্রীনহাউজ গ্যাস উৎপাদন খুবই কম, এবং দিনে দিনে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এর পরিমান আরও কমে যাচ্ছে। তাছাড়া, পরিচলনের সময়ে (বিদ্যুৎউৎপাদনের সময়) এটা থেকে কোন ক্ষতিকারক গ্যাস উৎপাদিত হয় না।

আধুনিক বায়ু টার্বাইনগুলো অনেক ধীরগতিতে ঘোরে (ঘূর্ণন/ মিনিট হিসেবে) , ফলে এগুলো দিয়ে পাখির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে।

৪. জোয়ার- ভাটার শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎউৎপাদন

যে সকল এলাকায় জোয়ার ভাটার পার্থক্য অনেক বেশি সেসব এলাকায় সমূদ্রের জোয়ার- ভাটার ঢেউয়ের শক্তি ব্যবহারে বিদ্যুৎউৎপাদন করা যেতে পারে। এটি একটি পূর্ণব্যবহারযোগ্য শক্তি এবং যতদিন চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিন করবে, ততদিন কার্যকর থাকবে। কিন্তু এটাতেও জলবিদ্যুৎপ্রকল্পের মত কিছু অসুবিধা রয়েছে।

জোয়ার- ভাটার শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎউৎপাদন করতে হলে সাধারণত বৃহদাকার বাঁধ দেয়ার দরকার পড়ে। এর ফলে বাঁধের দুই পাশের সামুদ্রিক প্রাণীদের বিচরণ বাধাগ্রস্থ হয়, ফলে সেখানকার জলজ বাস্তুতন্ত্র হুমকীর সম্মুখিন হয়।

এই ধরণের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হলে সেই এলাকার আশেপাশে জোয়ার ভাটার ব্যবধান কমে বা বেড়ে যেতে পারে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে পানিতে ডুবে থাকা বা শুকনা থাকার সময়কাল পরিবর্তীত হয় যা ওখানকার বাস্তুতন্ত্রকে পরিবর্তীত করে দিতে পারে।

৫. সৌরবিদ্যুৎ

সূর্যের আলোর সাহায্যে সৌরকোষের মাধ্যমে ডিসি বিদ্যুৎউৎপাদন করা যায়। এছাড়া, সূর্যের আলোর তাপ ব্যবহার করেও (অনেকগুলো প্রতিফলক আয়না লাগে) সাধারণ উপায়ে স্টীম জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎউৎপাদন করা যায়।

সৌরকোষের সাহায্যে বিদ্যুৎউৎপাদন আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট নিরাপদ মনে হলেও, এই কোষগুলো তৈরী করতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করতে হয়। ফলে সৌরকোষের কারণে ঐ সংক্রান্ত কিছু দূষণ ঘটে।

সৌরকৌষ দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎলেড- এসিড ব্যাটারীতে সঞ্চয় করতে হয়। কারণ রাত্রে বিদ্যুৎউৎপাদন হয় না। এই ব্যাটারীর উপাদানগুলোর কারণেও কিছুটা দূষণ ঘটতে পারে (ব্যাটারি উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং নষ্ট ব্যাটারি ফেলার প্রক্রিয়ায়) ।

৬. আনবিক চুল্লীর দ্বারা বিদ্যুৎউৎপাদন

আনবিক চুল্লীগুলো জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করেনা বলে এরা সরাসরি কার্বন ডাই- অক্সাইড নির্গমণ করে না। একক ওজনের জ্বালানী থেকে আনবিক পদ্ধতিতে অনেক বেশি শক্তি পাওয়া যায় বলে, এর জ্বালানীগুলো আহরণ, সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা পরিবহনের সময় যতটুকু কার্বন ডাই- অক্সাইড উৎপন্ন হয় জীবাশ্ম জ্বালানীর সাথে তুলনামূলক বিচারে তা খুবই সামান্য।

বড় ধরণের আনবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদকগুলো ঠান্ডা করার কাজে যে পানি ব্যবহার করা হয়, সেই গরম পানিগুলো সাধারণত আশেপাশের জলাশয়ে ফেলা হয়। এর ফলে জলাশয়ের অংশবিশেষে অনাকাঙ্খিত তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে যা সেখানকার বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে ফেলে।

আনবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানো রোধ করার জন্য বিভিন্ন নিয়মনীতি রয়েছে। এগুলো মেনে চললে তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর আশংকা থাকে না। তবে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কিছুটা তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এর জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিডয়াম আহরণের সময় খনি এলাকার আশেপাশে পরিবেশ দূষিত হতে পারে। ব্যবহৃত জ্বালানী নিষ্কাশনের নিরাপদ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে; নিরাপদ পদ্ধতি আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদে এই জ্বালানী মজুদ করে রাখার বিষয়টা গভীর বিবেচনা এবং সমালোচনার মধ্যে আছে।

এছাড়া আনবিক শক্তি কেন্দ্রের জন্য ব্যবহারযোগ্য জ্বালানী ঐ কাজে ব্যবহার না করে আনবিক/ পারমানবিক অস্ত্র বানানোর জন্য ব্যবহার করার অপচেষ্টা হতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী পারমানবিক অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ার পথে হুমকীস্বরূপ।

পারমানবিক চুল্লীর কাঠামোটাই (Reactor) তেজষ্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়। তাই স্বল্পখরচের নিরাপদ নিষ্কাশন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত এগুলোকে নিরাপদে মজুদ করে রাখতে হবে।

৭. ভূ- গর্ভস্থ তাপের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন

কিছু কিছু এলাকায় বিশেষত আগ্নেয়গিরির আশেপাশের স্থানে ভূগর্ভস্থ তাপ ব্যবহার করে বিদ্যুৎউৎপাদন করা যেতে পারে (Geothermal Power)। ভূপৃষ্ঠের গভীরে যে তাপ আছে তার প্রভাবে পানি থেকে উৎপন্ন গরম বাষ্প ব্যবহার করে টারবাইন জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎউৎপাদন করা হয়।

এ ধরণের পদ্ধতিতে কোন জ্বালানী পুড়ানো হয় না, তাই সেই কারণে দূষণ ঘটে না।

কিন্তু ভূগর্ভস্থ কূপগুলো থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এই বাষ্পের সাথে এমন সব পদার্থ মিশ্রিত থাকে যে বিদ্যুৎউৎপাদনের পূর্বে সেগুলোকে অবশ্যই বাষ্প থেকে আলাদা করতে হয় এবং পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশিত করতে হয়।

এছাড়া এই ধরণের পদ্ধতিতে শীতলীকরণের জন্য ব্যবহৃত পানি জলাশয়ে ফেললে তাপদূষণের কারণে সেখানকার স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

৮. নেগাওয়াট পদ্ধতি (বিদ্যুৎ সাশ্রয়)

এই পদ্ধতিটি আসলে কোনো বিদ্যুৎউৎপাদন পদ্ধতি নয়, বরং বিদ্যুৎউৎপাদনের বিকল্প হিসেবে সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা মেটানোর বিকল্প পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চাহিদা বনাম সরবরাহের সমীকরণে সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদা মেটানোর পরিবর্তে চাহিদা কমিয়ে সীমিত সরবরাহের মধ্যে আনার চেষ্টা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নেগাওয়াট পদ্ধতির অন্তর্গত।

কাজেই বিদ্যুৎসাশ্রয়ের জন্য বিনিয়োগকে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের খরচ এবং পরিবেশের উপর প্রভাবের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কাজেই বিদ্যুতের সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎব্যবহারকারী যন্ত্রগুলোর ব্যবহার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে:

শক্তি সাশ্রয়ী বাতি - পরিবেশের উপর এর প্রভাব সামান্য।

ভবনসমূহের তাপ ও বায়ু নিরোধী ব্যবস্থা উন্নয়নকরণ – পরিবেশের উপর এটির প্রভাবও সামান্য।

পুরাতন যন্ত্রপাতি এবং কারখানাকে প্রতিস্থাপন করা - পরিবেশের উপর এর খারাপ প্রভাব সামান্য, বরং নতুন উন্নত যন্ত্রপাতি থেকে কম দূষণ হওয়ার ফলে সেটা পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাবে।

বিদ্যুৎসাশ্রয়ের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চাহিদার চাপ (Peak demand) কমানোর জন্য বা সেটাকে অন্য সময়ে সরিয়ে দেয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

সঞ্চয়ী হিটার – পুরাতন ব্যবস্থাগুলোতে অ্যাসবেস্টস ব্যবহৃত হত। নতুন ব্যবস্থায় তা না থাকায় পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব নাই। এছাড়া চাহিদা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন এলাকায় বিদ্যুৎসরবরাহ বাড়িয়ে বা কমিয়ে নির্দিষ্ট প্রকার গ্রাহকের চাহিদা নিয়ন্ত্রন করা যায় – এতে পরিবেশের উপর সামান্য প্রভাব পড়বে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের জন্য আগের রাত্রে বরফ বানিয়ে তাপনিরোধী উপায়ে রক্ষা করে সেটা পরদিন ব্যবহার করা যায় – এতেও পরিবেশের উপর সামান্য প্রভাব পড়বে।

রাতে যখন বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকবে তখন জলবিদ্যুৎপ্রকল্পে উৎপন্ন অতিরিক্ত বিদ্যুৎখরচ করে নিচ থেকে কিছু পানি উপরের জলাধারে তুলে রাখা যেতে পারে। এতে পরিবেশের উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়বে। অন্যান্য শক্তি সাশ্রয় ও ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি - পরিবেশের উপর বিভিন্ন রকম প্রভাব ফেলে।

এখানে উল্লেখ্য যে, উচ্চ চাহিদার সময় পরিবর্তন করাতে মোট বিদ্যুৎচাহিদা কমবে না। তবে এর ফলে উচ্চ চাহিদার চাপের সময় সেটা মেটাতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র বানানোর খরচ বাঁচিয়ে দেবে।

উপসংহার

বিদ্যুৎউৎপাদনে আপাতদৃষ্টিতে যতটুকুই খরচ মনে হউক না কেন এর ফলে সামগ্রিকভাবে পরিবেশের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সেগুলোর ক্ষতির পরিমান অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বেশি হয়। কিছু কিছু ক্ষতি আছে যা অপরিবর্তনীয়।

তাই সভ্যতার জন্য অপরিহার্য বিদ্যুৎউৎপাদনের সময় তুলনামূলক বিচারে কম ক্ষতিকারক (সরাসরি খরচ এবং পরিবেশের মূল্য) প্রভাব সম্পন্ন বিষয়টা বেছে নেয়া জরুরী। অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দূরবর্তী স্থানে উৎপাদিত বিদ্যুৎআমদানী করার সময় পরিবেশের উপর বিদ্যুৎপরিবহন তার/ টাওয়ারগুলোর বিদ্যুৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টাও বিবেচনায় আনতে হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেহেতু ক্ষতি এড়ানো সম্ভব নয় তাই যতদুর সম্ভব এর অপচয় এবং অদক্ষ ব্যবহার কমিয়ে ফেলাটাই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা বলে মনে হয়। পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবগুলো কাটিয়ে উঠতে পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড / প্রকল্পের কথাও বিবেচনা করা উচিত।

তথ্যসূত্রসমূহ:

১. http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint
২. http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_concerns_with_electricity_generation
৩. Environmental Impact of Power Generation By R. E. Hester, Royal Society of Chemistry

অপরিকল্পিত নগরায়ন, পরিবেশ দূষণ
এবং আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

লিখেছেন,   ফাহমিদা ইয়াসমিন

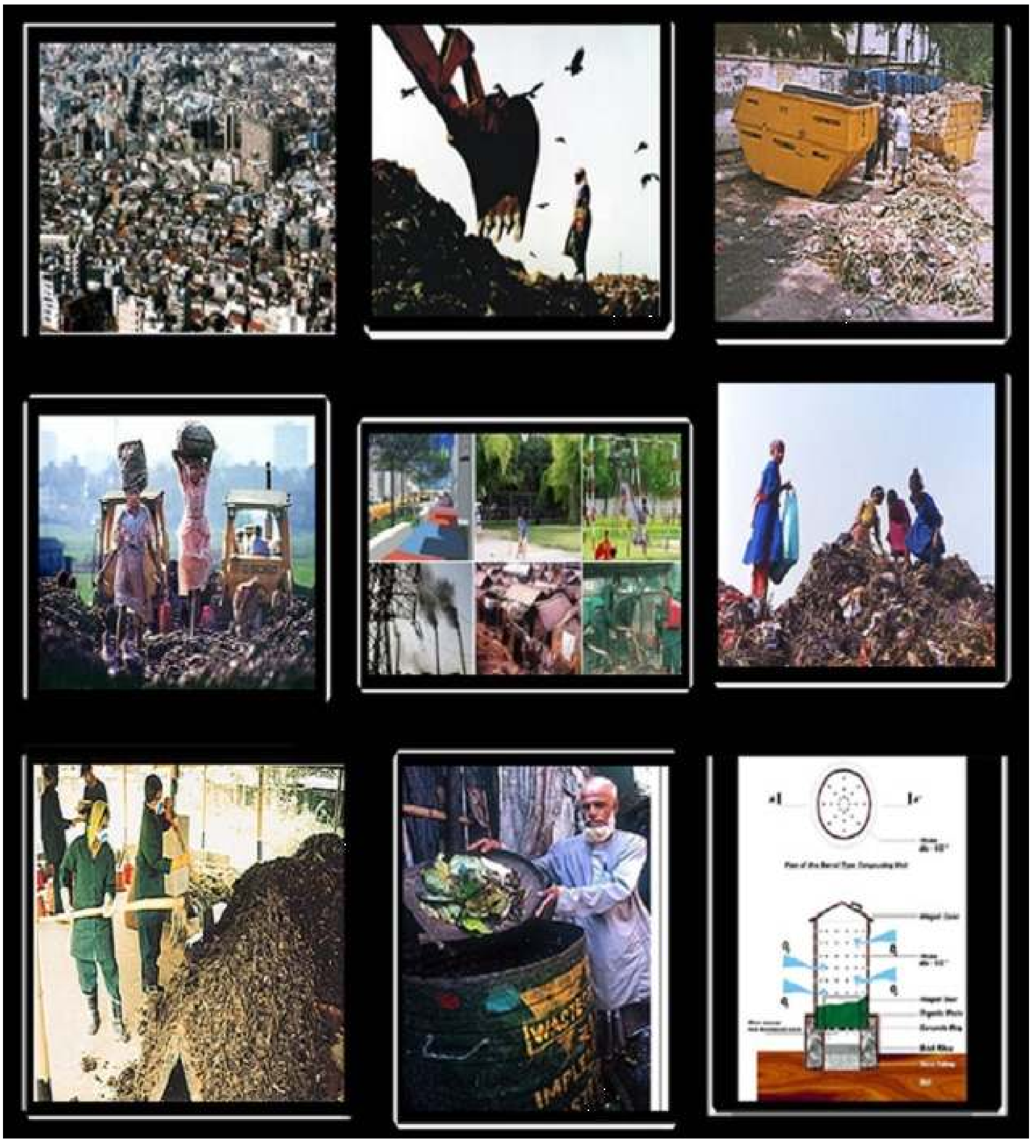

অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং পরিবেশ দূষণ

হতাশ চোখে ছমীরন চেয়ে থাকে । দশ বছর আগেও এখানে মাঠ ছিল, ঘাস ছিল, প্রজাপতির বাস ছিল। আর এখন এখানে খেলা করে কালো কালো ধোঁয়া। রড, সিমেন্ট আর কংক্রীট পাশাপাশি গা লাগিয়ে জুড়ে দিয়েছে আত্নীয়তার বিশাল বন্ধন। সুবিশাল আকাশটা'কে আর দেখা যায় না। শিশুগুলো বেড়ে উঠছে চেয়ারের উপর । সেই ছুটোছুটি নেই, দাপাদাপি নেই, পুকুরের পানিতে গা ভাসানোর অপার স্বাধীনতা নেই। মুখে কাপড় বেঁধে মানুষ গুলো কর্মব্যস্ত দিন কাটায়। কেউ কারো খোঁজ রাখে না। যন্ত্রের পৃথিবীতে নতুন নতুন কীটের মত পথ চলতে থাকে। আর সময়ের প্রয়োজনে পাড়ি দেয় অজানায়। এই হলো আমাদের নগর জীবন। এখানে ঘরের ১০০ ওয়াটের বাল্বটাকে সূর্য বলে মেনে নিতে হয়, ডিম লাইট টাকে কখনো কখনো চাঁদ ভেবে ভুল হয়। নিয়ন আলোর রঙিন আলোয় নিজের ছায়াটাকে ও অচেনা বলে মনে হয়। বাদল মুখর দিনে রাস্তা ঘাট হয়ে যায় নদী- নালা। বাংলাদেশ যে নদীমাতৃক দেশ তা আর কারো বুঝতে বাকি থাকেনা। রাজপথে শোভা পায় রাজনৌকা (রাজধানীর নৌকা)।

একটা সময় ছিল যখন মানুষ নিজের যেটুকু জমি জমা ছিল তাই সম্বল করেই কাটিয়ে দিত দিনের পর দিন। আজ জীবনের প্রয়োজনে পাড়ি দেয় শহরের পথে। জমি গুলো আজ কংক্রীটের চাদর, নদীগুলো বন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাজ নেই, ছাদ নেই, শুধুই বেঁচে থাকা। ডাস্টবিনের সুমিষ্ট (তথাকথিত) দূর্গন্ধ পারফিউমের আর্কষনীয় গন্ধকেও হার মানায়। কিন্তু কেন এই দূর্গতি? এর পেছনের মূল কারণ হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনার অভাব। অপরিকল্পিত নগরায়ন ক্রমশ: আমাদের ঠেলে দিচ্ছে একটা দূর্বির্ষহ জীবনের দিকে।

নগরায়ন আসলে কি?

নগরায়ন হলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রাম থেকে শহরের দিকে মানুষের অভিপ্রায়ন। অথবা আমরা এটাকে শহর মুখিতাও বলতে পারি কিংবা একে সভ্যতার ক্রমউন্নয়নও বলা যায়। নগরায়নের ফলে গ্রামগুলোর বৈশিষ্ট্য বিলোপ পেয়ে শহরের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। আধুনিক জীবন ব্যবস্থা, বাড়িঘরের কাঠামোগত উন্নয়ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্হা নগরায়নের বৈশিষ্ট্য। ক্রমাগত কৃষি জমির সংকোচন, নদীভাঙ্গন, শিল্পায়ন মানুষকে শহরমুখী করে তোলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কেন শহরমুখী হয়। আমরা যদি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে সহজেই এর কারণগুলো চিহ্নিত করতে পারবো। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করে তুলতে ব্যক্তিগত এবং যৌথ প্রয়াস দুটোর মাধ্যমেই নগরায়ন স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। শহরে বসবাসের ফলে ব্যক্তি এবং পরিবার দুটোই আধুনিক জীবন যাপন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদানের মত বৈচিত্রের সুবিধা ভোগ করে। মূলত অর্থনৈতিক কারণেই মানুষ গ্রাম থেকে শহরমূখী হয়। কেননা গ্রামের তুলনায় শহরে অর্থ এবং সম্পদ কেন্দ্রীভূত। সামাজিক গতিশীলতার কারণে শহরে ভাগ্যকে তৈরী করে নেওয়া সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা শহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ফলে কর্মসংস্হানের সুযোগ বৃদ্ধি সহ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কাঁচামালের সহজলভ্যতা, তথ্যের সহজ আদান-প্রদান শহরমূখীতার অন্যতম কারণ। শিল্প-বাণিজ্য, পর্যটন, বৈদেশিক বাণিজ্য যাই বলি না কেন সবকিছুই শহরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। অন্যদিকে, আরো বেশী মুনাফা করার লক্ষ্য নিয়ে গ্রামের কৃষকরাও শহরমুখী হয়। শহরের কাজগুলোতে বিবিধ কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। সামান্য কৃষি ব্যবস্থার কথাই যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে, কৃষকরা তাদের পরিপূর্ন শ্রম নিয়োগ করেও যথার্থ মূল্য পাচ্ছেনা। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে তাদের ন্যায্য মুল্য থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। অথচ যোগাযোগ ও পরিবহনের সুযোগ ভোগ করে অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ নিচ্ছে মধ্যভোগী দালালেরা। মানুষের মৌলিক যে প্রয়োজন সেগুলোর সুযোগ সুবিধাও গ্রামের চেয়ে শহরে ভিন্ন। গ্রামের স্বাস্থ্যসেবার কথাটাই ধরা যাক। আমাদের গ্রামগুলোতে জনসংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত হাসপাতাল, ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ , এ্যামবুলেন্স কিছুই নেই। বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা সব শহরেই থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সারা বাংলাদেশ খুঁজলে বোধহয় হাতে গোনা কিছু মফস্বল শহরে অল্পকিছু মানুষ পাওয়া যাবে যারা বিশেষজ্ঞ। যদিও এর সংখ্যাটা মৌচাকের একটা মাছির মত। তাই আধুনিক স্বাস্হ্যসেবা পেতেও মানুষগুলো শহরমূখী হচ্ছে। আরেকটা ব্যাপার , আমাদের কর্মসংস্হান সর্ম্পকিত বিষয়গুলো

শহরকেন্দ্রীক। বেশিরভাগ পরীক্ষাগুলোই রাজধানী কিংবা বিভাগীয় শহর কেন্দ্রীক। ফলে বার বার পরীক্ষা দেবার কষ্ট থেকে অব্যাহতি পেতে, সময় বাচাঁতে আর আরো বেশি বেশি পরীক্ষা যাতে দেয়া যায় তার জন্য পাস করার সাথে সাথেই অনেকেই রাজধানীমুখী হয়। ফলে রাজধানীতে চাপ পড়ে। প্রতি বছর যত মানুষ রাজধানী থেকে বেরিয়ে আসে, তার চেয়ে শতগুণ বাসা বাধেঁ এর কংক্রীটের দেয়ালে। চড়ুই পাখীর মত একই ছাদের নিচে বাস করে অনেকগুলো বাসা। দেয়ালের ফোকরে ফোকরে বাসা ঝুলতে থাকে। ফলে স্বাস্থ্য, বিনোদন, স্বকীয়তা সব কিছুই বাধাগ্রস্থ হয়। মানুষের শহরমুখিতার আর একটি বড় কারণ হলো বিনোদন। আধুনিক বিনোদন উপভোগ করতে গ্রাম থেকে মানুষ শহরের দিকে আকৃষ্ট হয়। জীবনের কি স্বার্থকতা যদি একদিন চিড়িখানায় না যাই, ফ্যান্টাসী কিংডমের রাইডগুলো না ছুঁয়ে দেখলে, দুচোখ ভরে না দেখলে এ দৃষ্টির কি মূল্য আছে, কোথায় পুকুরে দাপাদাপি আর কোথায় নন্দনের সুইমিংপুলের অবাধ সাঁতার কিসের সাথে কিসের তুলনা? পান্তাভাত আর পোলাও কি এক হলো? আরে চিড়িয়াখানার রয়েল বেঙ্গল না দেখলে কি চোখ জুড়োয়? অথচ যেখানে এর উৎপত্তি সেখানে যাবার সময় হয়না। এমনকি স্থানীয় জনগণও সুন্দরবনের বাঘের চেয়ে রাজধানীর আধুনিক বাসায় বসবাস করা বাঘ দেখতে ভালবাসে। অথচ স্থান এবং অবস্থানের কারণে সমগোত্রীয় দুই প্রাণীর চেহারা দুই রকম। বাঘের কথা থাক, মানুষের কথায় আসি। মানুষগুলো যেভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে , বাঘগুলোর বন ছেড়ে বনবিলাসে(চিড়িয়াখানা) না এসে উপায় কি।

ক্রমাগত মানুষের শহরমূখীতার ফলে এবং ক্রমর্বধনশীল মানুষের চাহিদা মেটাতে শহরগুলোতে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে বাড়ি-ঘর, হাট- বাজার, শিল্পকারখানা, অফিস, গার্মেন্টস, শপিং মল,ইত্যাদি। যারফলস্বরূপ,পরিবেশে বিপর্যয় ঘটছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে অপর্যাপ্ত বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের অভাব, যানজট,জলাবদ্ধতা, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পাহাড়ী এলাকাসমূহে পাহাড় কেটে বাড়িঘর রাস্তাঘাট তৈরী শহরগুলোর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিটি জেলা শহরে একই সমস্যা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত বাড়িঘর, দোকানপাট, বৃদ্ধি পাচ্ছে যানবাহন, গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা। অধিকাংশ শিল্পকারখানাগুলোর বর্জ্য ফেলা হচ্ছে নদীতে। ফলে নদীগুলো ক্রমশঃ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ড্রেজিংয়ের অভাবে নদীগুলো তার নাব্যতা হারাচ্ছে। প্রতিবছর অনেক নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। যেগুলোতে পানি আছে তাও প্রায় ব্যবহারের অনুপযোগী। নাব্যতা হারানোর ফলে দেশের মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া শিল্প কারখানার বর্জ্য শুধু নদী ভরাট করছে তা নয়, সেই সাথে পানি দূষিত করছে এবং পানি দূষণের কারণে কৃষি জমি,

মৎস্য সম্পদ ও পরিবেশেরও ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটি রিপোর্ট মতে, পরিবেশ দূষণের ফলে ঢাকার পানির মান নষ্ট হয়ে যাওয়া, বায়ু দূষণ এবং নদী ও জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের যে ক্ষতি হচ্ছে তা জিডিপির ২.৭ শতাংশেরও বেশি।

এক নজরে শহরমূখীতার কারণসমূহ:

- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্হা
- তথ্যের সহজলভ্যতা
- কর্মসংস্থান
- শিল্প কারখানার প্রসার
- আধুনিক জীবন যাত্রা
- উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
- বিনোদন

অপরিকল্পিত নগরায়নের প্রভাব

অর্থনৈতিক প্রভাব:

গত কয়েকবছর ধরে গ্রামাঞ্চলে নগরায়নের প্রভাব বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: কৃষিক্ষেত্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, হস্ত শিল্প, এন.জি.ও, মোবাইল ক্লিনিক ইত্যাদি। এখন ব্যাংকগুলোও শাখা বৃদ্ধির বদলে এস.এম.ই ‘র প্রতি প্রাধান্য দিচ্ছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় এলাকার চেয়ে বড় বড় শহর গুলোতে বিশেষায়িত পণ্যদ্রব্য ও সেবাসামগ্রী বেশি সহজলভ্য। এর কারণ হচ্ছে শিক্ষিত দক্ষ জনগোষ্ঠী, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাইকারী বাজার হিসাবে শহরগুলোর কেন্দ্রস্থল, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি। ফলে মানুষের শহরমুখীতা দিন দিন বেড়েই চলছে।

প্রাকৃতিক প্রভাব:

অপরিকল্পিত নগরায়নের অন্যতম ক্ষতিকর দিক হলো উষ্ণতা বৃদ্ধি। মানুষ ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, কারখানা তৈরী করতে গাছপালা কেটে ফেলছে। পৃথিবী হয়ে পড়ছে মরুময়। পর্যাপ্ত বনাঞ্চল না থাকায় বায়ুমন্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় পরের বছরগুলোতে গরম বেশি পড়ছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে আশেপাশের অঞ্চল গুলোর চেয়ে শহরগুলোতে (২ থেকে ১০ ডিগ্রী ফারেনহাইট) তাপমাত্রা বাড়ছে । যার ফলে কৃষি জমিতে আদ্রর্তা হ্রাস পাচ্ছে এবং বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমর্বধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে গাড়ি। ঋতুতে ও এসেছে পরির্বতন। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ থেকে পরিণত হচ্ছে ত্রি- ঋতুর দেশে। এখন আমরা তিনটা ঋতু বেশি প্রত্যক্ষ করি গ্রীষ্ম,র্বষা আর শীত। শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত সব ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে বসেছে। শীতকালেও দেখি শ্রাবণের ঘনঘটা। কলকারখানার দূষিত কালো ধোঁয়া, গাড়ির কালো ধোঁয়া বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাঁট, ঘরবাড়ি, ড্রেনেজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে জনজীবনে দূর্ভোগ। সম্প্রতি পরিবেশ দূষণের রেটিং- এর উপর ভিত্তি করে বিশ্বের শীর্ষ পঁচিশটি নোংরা শহরের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আমাদের প্রিয় মেট্রোপলিটন মেগাসিটি এবং তিলোত্তমা নগরী ঢাকা। সেই সাথে পৃথিবীর সবচাইতে নোংরা শহরগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে "second dirtiest city of the world' বলেও আখ্যায়িত

হয়েছে এটি। বিশ্বের কোন শহর সবচাইতে নোংরা তা নির্ধারণ করবার জন্য ২০০৭ সালে Health and Sanitation Ranking সংস্থাটি বিশ্বের মোট ২১৫টি শহরের বায়ু দূষণের মাত্রার উপর ভিত্তি করে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়। যাচ্ছে।স্বাস্থ্য- সেবা, ঔষধ প্রাপ্তি এবং সেইসাথে হসপিটাল ও চিকিৎসার সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ও এর অর্ন্তভুক্ত।

বর্জ্য ফেলার জন্য ভু- উপরিভাগে তেমন কোনো জায়গা না থাকায় বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা প্রসেস মিলগুলোর (সুতা রং করার কারখানা) বর্জ্য এখন পাঠানো হচ্ছে মাটির নিচে।ভূ- গর্ভ দিয়ে সেই বর্জ্য মিশে যাচ্ছে পানির স্তরে। ফলে দুষিত হচ্ছে নলকুপের পানি। এলাকার লোকজন সেই পানিই পান করছে, ব্যবহার করছে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে। দেখা দিচ্ছে নানা পানিবাহিত রোগ।বর্জ্যরে কারণে নদীর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাচ্ছে। ফলে জলজ জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। বুড়িগঙ্গায় এখন দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ প্রতি লিটারে মাত্র ১.১ মিলিগ্রাম ।বিশেষজ্ঞদের মতে, নদীর পানি দূষিত হয় শতকরা ৬০ ভাগ কলকারখানার বর্জ্য ও ট্যানারী শিল্পের বর্জের কারণে। আর শতকরা ৪০ ভাগ মিউনিসিপ্যালিটির বর্জ্য দিয়ে। এরফলে নদীর পানি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাচ্ছে বা থাকছে না । এরফলে জলজ জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে।

এবার আসা যাক দূষণ কি? সহজ বাংলায় ভাল কিছুর সাথে খারাপ, ক্ষতিকর কিছুর সংমিশ্রণই হলো দূষণ। কিন্তু যতটা সহজে দূষণ বাবাজী কে সংঙ্গায়িত করলাম ব্যাপারটা আসলে মোটেই ততটা সহজ নয়। আভিধানিক অর্থে দূষণ বলতে স্পর্শ বা অবিশুদ্ধ বস্তু মিশ্রণের মাধ্যমে নোংরা, দূষিত বা রোগগ্রস্ত করা বোঝায়। আর পরিবেশ দূষণ বলতে পরিবেশের সাথে এসব ক্ষতিকর বস্তুর সংমিশ্রণ বোঝায় যা পরিবেশ কে অস্হিতিশীল,বিশৃংখল, ক্ষতিকর এবং অস্বস্তিদায়ক করে তোলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দূষণ কত ধরনের হতে পারে। এটা রাসায়নিক বস্তু বা পর্দাথ হতে পারে, অথবা শক্তি যেমন শব্দ, উত্তাপ, অথবা আলো হতে পারে। এ দূষক গুলো প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট হতে পারে আবার মানবসৃষ্টও হতে পারে। এবার আমরা জানবো দূষণের প্রকারভেদ:

যে যে ক্ষেত্রে দূষণ ঘটছে	দূষক/দূষণের কারণ	পরিবেশের উপর প্রভাব
বায়ু	কল- কারখানা এবং গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া বায়ুর সাথে সংমিশ্রিত হয় যাতে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান যেমন : কার্বনমনোঅক্সাইড, সি.এফ.সি(ক্লোরোফ্লোরোকার্বন),নাইট্রোজেন অক্সাইড, ইত্যাদি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক	বায়ু মন্ডলে কার্বন- ডাই- অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এসিড বৃষ্টি, বৈশ্বয়িক উষ্ণতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমনঃবন্যা, খরা,ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি বৃদ্ধি
পানি	শিল্পকারখানার বর্জ্য পর্দাথ, ট্যানারীর বর্জ্য, অপরিকল্পিত এবং অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বড় বড় জাহাজের বর্জ্য পদার্থ, ইত্যাদি	নদীর পানি দূষণের ফলে ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়া, নদী ভরাটের ফলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস, ভূ- পৃষ্ঠের নীচের পানি দূষণের ফলে আর্সেনিক সহ নানা প্রকার পানিবাহিত রোগের প্রকোপ
শব্দদূষণ	জোরে হর্ণ বাজানো	শ্রবণ শক্তি হ্রাস
মাটি দূষণ	অপচনশীল দ্রব্যের সংমিশ্রণ, শিল্প কারখানার বর্জ্য	উর্বরতা শক্তি হ্রাস
অন্যান্য	অতিরিক্ত আলোক সজ্জা	বিদ্যুৎ শক্তির অপচয়, লোডশেডিং, দৃষ্টি শক্তি হ্রাস ইত্যাদি

বাংলাদেশ যদিও একটি উন্নয়নশীল দেশ কিন্তু এদেশের মূল কাঠামো হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক। ১৯৫১ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪.৩৩% শহরে বাস করতো। কিন্তু ২০০১ সালে এটা ২১% এ এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ মানুষের শহরমূখীতার কারণ হলো

দারিদ্রতা। গ্রামের মানুষগুলো দারিদ্রতার শোচনীয় অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে শহরেরমুখী হচ্ছে। ফলে শহরগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মত বস্তি ,ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে। বিশেষ করে বিভাগীয় শহরগুলোতে এই অবস্থা বেশী পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশে নগরায়ন:

বছর	শহরে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা	শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা হার	বার্ষিক বৃদ্ধির শতকরা হার (%)
১৯৫১	১৮১৯৭৭৩	৪.৩৩	১.৬৯
১৯৬৪	২৬৪০৭২৬	৫.১৯	৩.৭৫
১৯৭৪	৬২৭৩৬০২	৮.৭৮	৬.৬২
১৯৮১	১৩৫৩৫৯৬৩	১৫.৫৪	১০.৬৩
১৯৯১	২০৮৭২২০৪	২০.১৫	৫.৪৩
২০০১	২৮৮০৮৪৭৭	২৩.৩৯	৩.২৭

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৯৭ ; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০১

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সবচেয়ে যে বিষয়টা সরাসরি জড়িত তা হলো বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। পৌরসভাগুলোর বর্জ্য সংগ্রহের গতানুগতিক পদ্ধতি, স্থানান্তর, অপরিশোধিত আর্বজনার স্তূপ, ইত্যাদির কারনে পরিবেশ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে। ফলে বাংলাদেশের শহর ও সিটি কর্পোরেশনগুলোতে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন একটি প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশই পৌরসভাগুলোই এখন অতিরিক্ত বর্জ্য সমস্যার সম্মুখীন। ফলে তারা প্রয়োজনীয় এবং মানসম্মত নাগরিক সুবিধা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে শহরগুলোতে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ গড়ে উঠছে। মানুষের জীবন হয়ে পড়ছে ঝুঁকির সম্মুখীন। এ ধরনের ভয়াবহ সমস্যা সমাধান করতে আমাদের অবশ্যই একটি পরিকল্পনামাফিক পদ্ধতিতে এগোতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বর্জ্যের পরিমাণ চিহ্নিত করা, বর্জ্যগুলোকে সংগ্রহ করা, এবং এগুলো পূর্নবাসিত করা।

বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

আবর্জনা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (ইংরেজিতে Waste Management) বলতে আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পূণর্ব্যবহার বা প্রক্রিয়াজাতকনণ এবং নিষ্কাশনের সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সাধারণত মানুষের কার্যকলাপে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংক্রান্ত কাজগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে; এবং ঐ বস্তুগুলোর থেকে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ক্ষতিকারক প্রভাব প্রশমিত করার জন্য, কিংবা পরিবেশের সৌন্দর্য্য রক্ষার কাজগুলোই এই প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া আবর্জনা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবর্জনা থেকে পরিবেশের ক্ষতি রোধ করার কাজ এবং আবর্জনা থেকে পূণর্ব্যবহারযোগ্য বস্তু আহরণ সংক্রান্ত কাজও করা হয়ে থাকে। এতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি এবং দক্ষতার দ্বারা কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় বর্জ্য সংক্রান্ত কাজ করা হয়। এবং বর্জ্যসমূহকে পূর্ণব্যবহার উপযোগী যেমন: প্লাস্টিক থেকে নতুন প্লাস্টিক সামগ্রী, পচনশীল(বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য এবং শাকসবজী) ইত্যাদি আর্বজনা থেকে কম্পোস্ট তৈরী ইত্যাদি করা হয়ে থাকে।

উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশভেদে, শহর বা গ্রাম্য এলাকাভেদে, আবাসিক বা শিল্প এলাকাভেদে আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ধরণ আলাদা হয়। সাধারণত স্থানীয় বা পৌরকর্তৃপক্ষ আবাসিক বা প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা থেকে উৎপন্ন অবিষাক্ত ময়লাসমূহের জন্য ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। অপরপক্ষে বানিজ্যিক বা শিল্প এলাকার অবিষাক্ত ময়লাগুলো ঐ ময়লা উৎপন্নকারীদেরকেই ব্যবস্থাপনা করতে হয়।

আবর্জনার প্রকারভেদ:

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবর্জনাকে শ্রেণীভেদ করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ময়লা সংগ্রহের সুবিধার্থে ময়লাকে এভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়:

- পৌর এলাকার আবর্জনা
- বানিজ্যিক এলাকার আবর্জনা
- শিল্প এলাকার আবর্জনা

যেখানে শেষ গন্তব্যস্থল হিসেবে ময়লাকে মূলত মাটিচাপা দেয়া হয় সেখানে শ্রেণীবিভাগটা এরকম:

- পচনশীল
- অপচনশীল

যে শহরে ময়লা পুড়ানো হয় সেখানে শ্রেণীবিভাগটা এমন হতে পারে:

- দহনযোগ্য (দহনযোগ্য ময়লা হচ্ছে সমস্ত পচনশীল বস্তু। রান্নাঘরের যাবতীয় উচ্ছিষ্ট, গাছপালার ডাল/পাতা, ঘাস, চামড়ার জুতা, স্যান্ডেল, ছোট কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি)
- অদহনীয়
- পূণর্ব্যবহারযোগ্য
    - প্লাস্টিক
    - পুরাতন কাপড়
    - খবরের কাগজ
    - পেট- বোতল
    - কাঁচের বোতল
    - ধাতব বস্তু
- অতিরিক্ত বড় ময়লা
- ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যাদি

বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ:

বাংলাদেশের মোট এলাকার মধ্যে শহরের পরিমাণ ৫১৪, যার মধ্যে ৬টি সিটি কর্পোরেশন, ২৯৮ টি পৌরসভা, এবং ২১০ টি অন্যান্য এলাকা। অধিকাংশ জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশে উৎপাদিত র্বজ্যর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশী। শুষ্ক মৌসুমে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (JICA স্ট্যাডি রির্পোট, ২০০৪)

শহর	WGR* (কেজি/প্রতি দিন)	শহরের সংখ্যা	আনুমানিক জনসংখ্যা (২০০৫)	মোট জনসংখ্যা** (২০০৫)	TWG***(টন/দিন)		গড় TWG (টন/দিন)
					শুষ্ক মৌসুম	আর্দ্র মৌসুম	
ঢাকা[১]	০.৫৬	১	৬,১১৬,৭৩১	৬,৭২৮,৪০৪	৩,৭৬৭,৯১	৫,৫০১,১৪	৪৬৩৪.৫২
চিটাগাং[২]	০.৪৮	১	২,৩৮৩,৭২৫	২,৬২২,০৯৮	১,২৫৮,৬১	১,৮৩৭,৫৭	১,৫৪৮.০৯
রাজশাহী[৩]	০.৩	১	৪২৫,৭৯৮	৪৬৮,৩৮৭	১৪০,৫১	২০৫,১৫	১৭২.৮৩
খুলনা[৪]	০.২৭	১	৮৭৯,৪২২	৯৬৭,৩৬৫	২৬১,১৯	৩৮১,৩৪	৩২১.২৬
বরিশাল[৫]	০.২৫	১	৩৯৭,২৮১	৪৩৭,০০৯	১০৯,২৫	১৫৯,৫১	১৩৪.৩৮
সিলেট[৬]	০.৩	১	৩৫১,৭২৪	৩৮৬,৮৯৬	১১৬.০৭	১৬৯,৪৬	১৪২.৭৬
পৌরসভাসমূহ	০.২৫	২৯৮	১৩,৮৩১,১৮৭	১৫,২১৪,৩০৬	৩,৮০৩,৫৮	৫৫৫৩,২২	৪,৬৭৮.৪০
অন্যান্য এলাকা সমূহ[৮]	০.১৫	২১০	৮,৩৭৯,৬৪৭	৯,২১৭,৬১২	১,৩৮২,৬৪	২০১৮,৬৬	১৭০০.৬৫
মোট	০.৪০ (গড়)	৫১৪	৩২,৭৬৫,৫১৬	৩৬,০৪২,০৬৭	১০,৮৩৯,৭৫	১৫৮২৬,০৪	১৩,৩৩২.৮৯

*WGR=Waste Generation Rate অর্থাৎ বর্জ্য উৎপাদনের হার **প্রবাহমান জনগোষ্টীর ১০% বৃদ্ধিসহ ***TWG=Total Waste Generation বা মোট উৎপাদিত/সৃষ্ট বর্জ্য যা শুষ্ক মৌসুমের তুলনায় আর্দ্র মৌসুমে ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় উৎস: [১] JICA ২০০৪,[২] চিটাগাং সিটি কর্পোরেশন,[৩] মাঠ পর্যালোচনা,[৪] Sinha 2000, [৫] মাঠ পর্যালোচনা, [৬] সিলেট কর্পোরেশন [৭,৮] মাঠ পর্যালোচনা

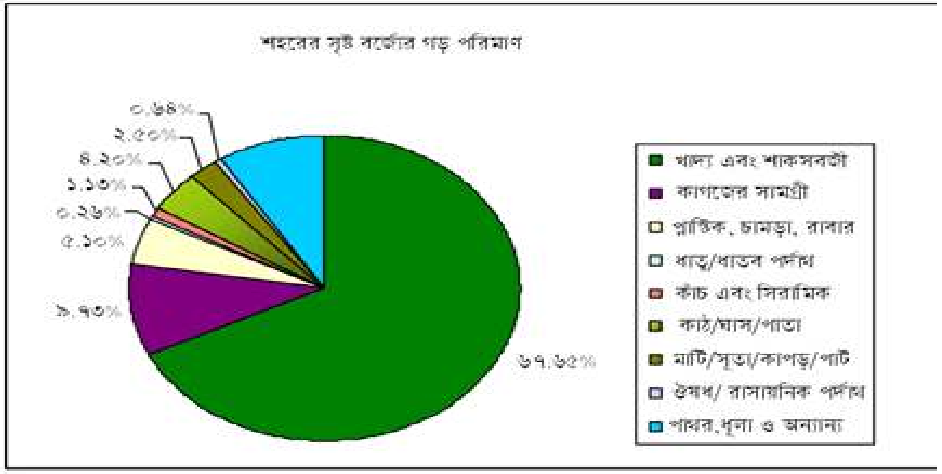

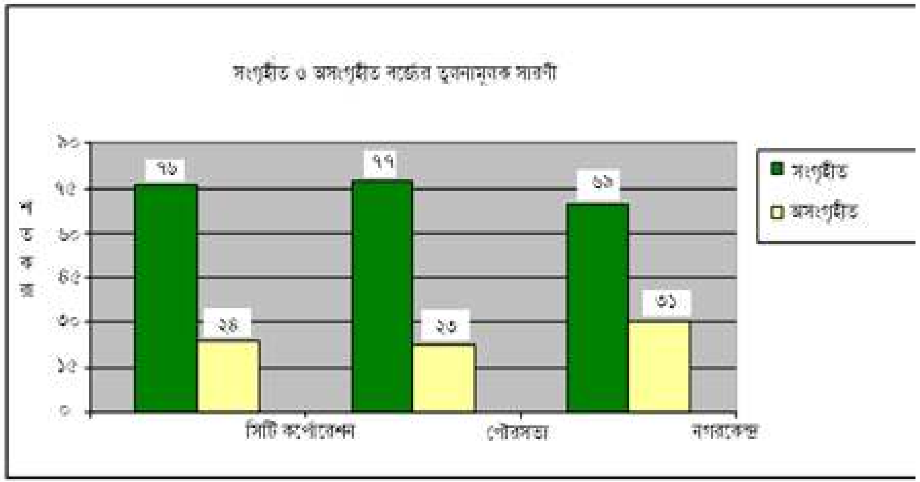

সূত্র: ওয়াস্ট সার্ভে রির্পোট ২০০৫

পরিবেশের উপর বাড়তি বর্জ্যের প্রভাব:

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ পাঁচ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও একই সময়ে শুধু পরিবেশ বিপর্যয়জনিত অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ চার শতাংশ জিডিপি'র সমান । শুধুমাত্র রাজধানীর পানি সম্পদের দূর্বল ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর ৬৭ কোটি ডলারের মত ক্ষতি হচ্ছে যার আর্থিকমূল্য সাড়ে চার হাজার কোটিরও বেশি। পরিবেশবাদী কয়েকটি সংগঠন দেশের সবচেয়ে দূষণকবলিত পাঁচটি নদীকে চিহ্নিত করেছে৷ পাঁচটির মধ্যে শীর্ষে থাকা তিনটি নদীই আছে রাজধানীকে ঘিরে৷ ঢাকার বাতাসে সীসার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, মহানগরীর নাগরিকদের যেসমস্ত রোগব্যাধি হচ্ছে তার ২২শতাংশের কারণ হলো **বায়ু দূষণ, অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভূ- পৃষ্ঠের পানি দূষণ**। পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে, রাজধানী ও আশপাশের শিল্প- কারখানা

থেকে মোট ৬২ ধরনের মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য নদীর পানিতে পড়ে। এসব বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে- সায়ানাইড, ক্রোমিয়াম, পারদ, ক্লোরিন, নানা ধরনের এসিড, দস্তা, নিকেল, ফসফোজিপসাম, সীসা, ক্যাডমিয়াম, লোহা, এ্যালকালি ইত্যাদি। এছাড়া হাজারিবাগে গড়ে ওঠা প্রায় আড়াইশ' চামড়া শিল্পে ক্রোমিয়ামসহ বেশ কিছু মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে বছরে প্রায় তিন হাজার মেট্রিক টন। এসব তরল রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ সরাসরি বুড়িগঙ্গার পানিতে গিয়ে পড়ছে। এছাড়া বুড়িগঙ্গার পানিতে মিশছে মহানগরীর পয়ঃবর্জ্য, কয়েক হাজার নৌযানের তেল- ময়লা প্রভৃতি। ফলে নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই মহানগরীর অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তাছাড়া শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, হাসপাতালের বর্জ্য এবং প্রতিদিন ঘরে ঘরে যে বর্জ্যের সৃষ্টি হয় তার শতকরা ৪০ ভাগই সিটি কর্পোরেশন অপসারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। যেখানে সেখানে ময়লা ও বর্জ্য ফেলা, এগুলোর নিষ্কাশন, উন্মুক্তভাবে অপসারণ জনগণের স্বাস্থ্যের উপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। সিটি কর্পোরেশনের অতি প্রাচীনতম লৌহনির্মিত বর্জ্য-ফিলগুলো আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন নয় এবং এক্ষেত্রে আমাদের যথাযথ পরিকল্পনার ও অভাব আছে। আমাদের অসচেতনতাও এজন্য দায়ী। অনেকটা সে কারণেই ডাস্টবিনগুলোর মধ্যে ময়লা না ফেলে অনেকেই সেগুলো বাইরে উন্মুক্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা দূর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং সে কারণেই পরিবেশ হয় বিনষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ডাস্টবিনের ভেতর ময়লা না ফেলে পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। ডাস্টবিনের ঢাকনা চুরি তো সাধারণ ব্যাপার। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, শতকরা ৯৯ ভাগ ডাস্টবিনের ঢাকনাই উধাও। সিটি কর্পোরেশন শুধু নয়, মফস্বলেও ঢাকনা গায়েবের জাদুকরী খেলা বর্তমান। বার বার ঢাকনা লাগানো বাড়তি খরচের ব্যাপার। ঢাকনা না থাকার ফলে কুকুর, বেড়াল, ও অন্যান্য প্রাণী ময়লাগুলোকে চারপাশে ছড়িয়ে ফেলে। ফলে ক্ষতিকারক রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। অনেকসময় এসব বিক্ষিপ্ত আর্বজনা ড্রেনেজ ব্যবস্থার উপর বাড়তি চাপ ফেলে। জলাবদ্ধতা, পয়ঃ নিষ্কাশন সমস্যা এর অন্যতম উদাহরণ। আসলে আমরা আমাদের নিজেদের সম্পর্কে এখনো সচেতন নই। ফলে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নির্মিত জিনিসগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ না করে উল্টো ক্ষতি করছি। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পার হয়ে এসেও কোনটা আমাদের জন্য ভাল আর কোনটা খারাপ তা এখনো বুঝতে শিখিনি। তাই ম্যানহোল কিংবা ডাস্টবিনের ঢাকনা বা নলকূপ চুরি আমাদের কাছে কোন ব্যাপারই না। **"চুরি করলে সরকার দেবে আমাদের কি বা আমার জিনিস আমি নিয়েছি, এগুলোতো জনসাধারণেই সম্পত্তি"** এ জাতীয় চিন্তাবোধ বোধহয় স্বাধীন বাংলাদেশের চোরদের মাথায় পাকাপোক্ত আসন পেতেছে। অথচ এগুলো যে আমাদের কল্যাণের জন্যই এবং এগুলোর যথাযথ দেখাশোনা করা যে আমাদের দায়িত্ব আমরা বুঝিনা। কোন দেশের

সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয় প্রতিটি মহল্লায় গিয়ে তদারকি করা সে সরকার যত জনকল্যাণকামী হোক। কিংবা পৌরসভার পক্ষেও সম্ভব নয় প্রতি বেলায় এসে পরিষ্কার করে দেয়া। আমরা যদি একটু সচেতন হয়ে আমাদের সম্পদগুলোকে ব্যবহার করি তবে আমরাই এধরনের ছোটখাট সমস্যার সমাধান করতে পারি। পুরোপুরি সমাধান না হলেও অন্তত: সমাধানের পথে খানিকটা এগিয়ে যেতে পারি।

বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান চিত্র:

বর্তমানে বাংলাদেশে বর্জ্যব্যবস্থাপনার অবস্থা খুব একটা সুসংগঠিত নয়। তারপরও এ অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে জোর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কে কেন্দ্র করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে জোর পদক্ষেপ চলছে। অধিকাংশ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোন বিভাগ নেই। ফলে স্যানিটেশন সমস্যা সহ রাস্তাঘাট জ্যাম হয়ে আছে। দেশের এ দূরবস্থার তারতম্য ঘটে শহরগুলোর আকার এবং এর উপর লোকসংখ্যার চাপ অনুসারে। কিছু সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মী অস্থায়ী ভিত্তিতে ভাড়া করা হয়। বর্জ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার, যানবাহনের বর্জ্য পরিষ্কার ইত্যাদি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া আরেকটি সমস্যা হচ্ছে অধিকাংশ শহরগুলোতেই এ সংক্রান্ত কাজের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এ বলা হয়েছে যে কোন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা কিংবা এ ধরনের প্রজেক্ট হাতে নেবার পূর্বে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার দিকটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা ১৯৯৭ এ পরিবেশদূষণ এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করে শিল্পকারখানা এবং এ জাতীয় প্রজেক্টকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর অন্তর্গত বিভাগগূলো হলো:

১.সবুজ ২.কমলা- ক ৩.কমলা- খ ৪.লাল

কমলা- খ এবং লাল বিভাগের অধীনে নতুন শিল্পকারখানা এবং প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাবার জন্য একটি IEE(Initial Environmental Examination) রিপোর্ট জমা দিতে হয় যেখানে সু- স্পষ্টভাবে কলকারখানা থেকে নির্গত ময়লা পানি কিভাবে নিষ্কাষিত হবে তার নকশা উল্লেখ করতে হয়। এছাড়াও পরিবেশ

দপ্তর থেকে EIA (Environmental Impact Assessment) রিপোর্ট ও অনুমোদন করতে হয়।

স্থানীয় আইনগত ব্যবস্থা:

এখন পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান বর্জ্য সমস্যার সমাধানের কোন আইন আমাদের দেশে তৈরী হয়নি। বর্জ্য নিষ্কাশনের দায়- দায়িত্ব স্থানীয় পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের উপরই নির্ভর করছে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা আইন ১৯৭৭ হলো একমাত্র আইন যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পরিচালিত করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১.সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোই স্থানীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পরিবেশ দূষণের ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করবে।

২. সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোই পাবলিক টয়লেট, রাস্তাঘাট, ড্রেন, বাড়িঘরের আর্বজনা ইত্যাদি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করবে।

বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতি:

বর্জ্য পর্দাথ নিষ্কাশন বাংলাদেশের শহরগুলোর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এর কারণ হিসেবে দ্রুত নগরায়ন, মানুষের শহরমূখিতা, ভোগ- বিলাসিতার ধরণ পাল্টানো এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা হয়। যদিও একটি মাত্র সমাধান দ্বারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয় তারপরও সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের ছোট এবং মাঝারী শহরগুলোতে এখনো সুবিধা করে উঠতে পারেনি। কথাটা একারণেই বলা যে, আসলে আমাদের সাধ আছে, সাধ্য নেই। তাই আমাদের সাধের কাছে সাধ্য অর্থ্যাৎ অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সুবিধা করে উঠতে পারছেনা। যাইহোক. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের মোট বাৎসরিক বাজেটের ৫২% ব্যয় করে বর্জ্য সংগ্রহ, স্থানান্তর এবং নিষ্কাশনের জন্য। এই বাজেটের প্রায় ৫০% সংগ্রহ করা হয় রাজস্ব হিসেবে এবং বাকিটা আসে সরকারের অনুদান হিসেবে।

প্রতি বছর প্রায় ১৬,৩৮০ টন বর্জ্য বাংলাদেশের শহর এলাকায় সৃষ্টি হয়। এগুলোকে আবার বিভিন্নভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন: গৃহস্থালীর বর্জ্য, পৌরসভার বর্জ্য, শিল্পকারখানার বর্জ্য, রাস্তাঘাট পরিষ্কার এবং হাসপাতালের বর্জ্য ইত্যাদি। ২০০5 সালের এক জরিপে দেখানো হয়, বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগে (ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট) উদ্ভূত বর্জ্যের পরিমাণ বাৎসরিক ৭৬৯০ টন। বিভিন্ন এলাকার গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক এলাকা, শিল্পকারখানা, ট্যানারী, ডাস্টবিন, খোলা জায়গা ইত্যাদি কে নমুনা

হিসেবে নেয়া হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত এই প্রবাহমান মোট বর্জ্যের/আর্বজনার৭৪.৪% হলো রাসায়নিক পদার্থ, ৯.১% কাগজ, ৩.৫% প্লাস্টিক, ১.৯% গার্মেন্টস শিল্পের বর্জ্য ও কাঠ, ০.৮% চামড়া এবং রাবার, ১.৫% ধাতু, ০.৮% কাঁচ, এবং ৮% হলো অন্যান্য আর্বজনা। পৌরসভাগুলোতে সৃষ্ট বর্জ্যের পরিমাণ দৈনিক ০.৩২৫ থেকে ০.৪৮৫ কেজি বা গড়ে ০.৩৮৭ কেজি প্রতিদিন। এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্য থেকে সম্ভাব্য পুনরুদ্ধার বা পুর্ণব্যবহার হতে পারে যার আর্থিক মূল্য $২১.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তিন ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধরণ আমাদের দেশে প্রচলিত। প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি বা যেটাকে বলা হচ্ছে Formal system. এ ব্যবস্থায় স্থানীয় ভাবে পুরাতন পদ্ধতিতেই বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় অর্থ্যাৎ পৌরসভার গাড়ি এসে নির্দিষ্ট একটি দিনে বর্জ্য সংগ্রহ করে। তারপর সেগুলো কোন খোলা জায়গায় রেখে আসে। বিশেষ করে ড্রেন পরিষ্কারের ব্যাপারটা মারাত্মক। ময়লাগুলোকে ড্রেন থেকে তুলে ড্রেনের পাশেই রাখা হয়। যা অল্প সময়েই আবারো ড্রেনের ভেতরেই ঠাঁই নেয়। এ ব্যবস্থায় সম্পদ পুনরুদ্ধার, পূর্নবাসন কিংবা পুনর্গঠন অনুপস্থিত। দ্বিতীয়টি হলো সামাজিক উদ্যোগ/স্বেচ্ছাসেবক বা Community Initiative। মূলতঃ বর্তমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট না হওয়ায় ব্যক্তিগত ভাবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে প্রাথমিক ভাবে কোন এন.জি.ও বা সি.বি.ও এর মাধ্যমে গৃহস্থালির বর্জ্য পর্দাথ সংগ্রহ করা হয়। এবং সবশেষে ঘরোয়া পদ্ধতি যেখানে বিপুল সংখ্যক কর্মী বর্জ্য পদার্থ বাণিজ্যিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। এ তিনধরনের সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকর ভাবে বর্জ্য

সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। নিচে বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরা হলো:

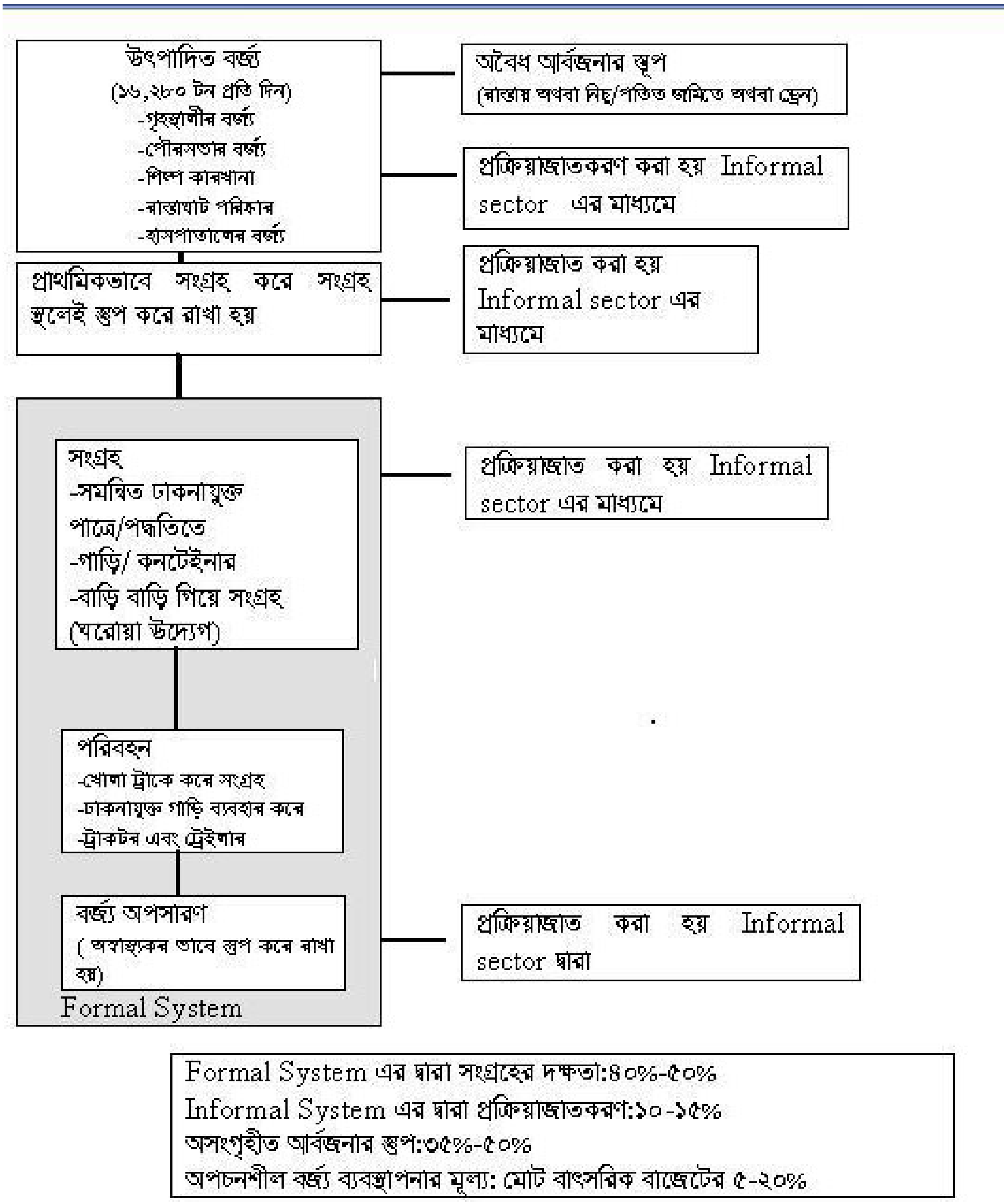

চিত্র: বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৬০% বর্জ্য আবাসিক এলাকায় সৃষ্টি হয় । শহরগুলোতে মানুষের জীবনযাত্রা, অভ্যাস, কার্যকলাপ,জনসংখ্যার ঘনত্ব ইত্যাদি ভেদে বর্জ্যের পরিমাণেও কমবেশি হয়ে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শুধু মাত্র ঢাকা শহরের সৃষ্ট বর্জ্যর পরিমাণ:

সৃষ্ট বর্জ্য	বাংলাদেশ (ঢাকা), ওজন শতকরায়
খাদ্য এবং সব্জির বর্জ্য পদার্থ	৭০
কাগজের সামগ্রী	৪
প্লাস্টিক	৫
পুরনো কাপড়	-
ধাতু বা ধাতব পদার্থ	০.১৩
কাঁচ এবং সিরামিক	০.২৫
কাঠ	০.১৬
বাগানের আর্বজনা	১১
অন্যান্য(পাথর, মাটি, কাদা, ইত্যাদি)	৫
আদ্রতা	৬৫

উৎস: আহমেদ,এম, এফ এবং রহমান, এম,এম,২০০০

বাংলাদেশের শহরগুলোতে সৃষ্ট বর্জ্যের পরিমাণ:

বছর	মোট জনসংখ্যা (শহর)	শহরের জনসংখ্যার শতকরা হার(%)	বর্জ্য উৎপাদনের হার(কেজি/ দৈনিক)	মোট উৎপাদিত র্বজ্যর পরিমাণ (টন/দৈনিক)
১৯৯১	২০৮৭২২০৪	২০.১৫	.৪৯*	৯৮৭৩.৫
২০০১	২৮৮০৮৪৭৭	২৩.৩৯	০.৫**	১১,৬৯৫
২০০৪	৩২৭৬৫১৫২	২৫.০৮	০.৫***	১৬,৩৮২
২০২৫	৭৮৪৪০০০০	৪০.০	০.৬**	৪৭,০৬৪

উৎস:ADBI এবং ADB,২০০০,*Zurbrugg ২০০২

উপোরোক্ত ছকে দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্জ্য উৎপাদনের হারেরও বৃদ্ধি হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৭ সালের সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল $২১৩, ২০০১ এ যার পরিমাণ ছিল $৩৫১ এবং ২০০৩ সালে এসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল $৩৭০ মার্কিন ডলার (Zurbrugg ২০০২)। অর্থ্যাৎ আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে যায়।

বর্জ্য সংগ্রহের বর্তমান পদ্ধতি:

সেই পুরাতন লেবার- ইনটেভসিভ পদ্ধতিই এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব, অদক্ষ ও অপর্যাপ্ত র্কমচারী ইত্যাদির কারণে মূল উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ এখনো উন্নত হয়নি। আবর্জনা সাধারণত: খোলা গাড়ি বা কন্টেইনারে করে আবাসিক এলাকার ডাস্টবিনগুলো থেকে সংরক্ষণ করা হয়। ১.৫- ৫ টনের ট্রাকে করে উন্মুক্ত অবস্থায় এই আবর্জনা গুলো বহন করা হয় যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশেপাশের পরিবেশ কে নষ্ট করে। উপরন্তু এসমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলোকে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয়। বর্জ্য সংগ্রহের পরিমাণও যথেষ্ট নয়। বর্জ্যগুলোকে স্থানান্তর করতে ৪থেকে ৫ বার হাত বদল হয়। তাছাড়া প্রথমে বর্জ্যগুলোকে ঝুড়িতে করে ট্রাকে ফেলা হয়। ফলে আশেপাশের স্থানে ময়লা বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে। এছাড়া আরো একটি বড় সমস্যা হলো অধিকাংশ বাড়ির লোক আবর্জনাসমূহ বাড়ির আশে পাশে ফেলে। ফলে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা বর্জ্য সংগ্রহ করা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে ৩৫%- ৫০% আর্বজনাই অসংগৃহীত রয়ে যায়। অসংগৃহীত বর্জ্য খোলা জায়গা, রাস্তায় জমে থাকে, ড্রেনে জমাটবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং পথচারীদের পথ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ড্রেনগুলোর জলাবদ্ধতা মশামাছির উপদ্রব সহ র্বষা মৌসুমে আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। এছাড়া এ সমস্ত অসংগৃহীত আর্বজনা সমূহ আরো অনেক রোগের জীবাণু বহন করে আনে। বর্জ্যের অপর্যাপ্ত নিষ্কাশনের শিকার হয় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমাজে এ সমস্যা অনেকটা কম। কেননা এসমস্ত ব্যাপারে তারা নিজেরাই অনেকটা উদ্যেগী হয়ে কাজ করে।

ঢাকা শহরের বর্জ্য স্তূপীকরণের চিত্র

অশোধিত বর্জ্যর স্তুপ

পৌরসভাকর্তৃক বর্জ্য সংগ্রহের চিত্র: সড়কে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে আর্বজনা

বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং এর পূণর্ব্যবহার

প্রায় ১,২০,০০০ লোক ঢাকা শহরে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত। সাধারণত: দরিদ্র লোকেরাই বর্জ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে ঢাকায় প্রায় ১৫ শতাংশ অর্থ্যাৎ ৪৬৭.৬৫ টনের বেশি বর্জ্য পর্দাথ প্রতিদিন প্রক্রিয়াজাত করা হয় (Sinha, ১৯৯৩).

বর্জ্য পর্দাথের কিছু অর্থনৈতিক মূল্য আছে যদি আমরা এগুলোকে সঠিক ভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে পারি।

এক নজরে বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র:

কার্যকলাপ	বাংলাদেশে এর অবস্থা
উৎসস্থল কর্তন	• সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেই • প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির পুরোটাই বেসরকারী উদ্যেগে পরিচালিত • যে সমস্ত বর্জ্যের অর্থনৈতিক মূল্য আছে যেমন: খবরের কাগজ, বোতল, ক্যান, কাঁচ, প্লাস্টিক, ধাতু, রবার, এবং বিভিন্ন কনটেইনার ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা

	উৎস থেকেই পৃথক করা হয় এবং বিক্রি করে দেয়া হয় • পুরনো কাপড়- চোপড় ডাস্টবিন, আর্বজনার স্তুপ থেকে টোকাইরা সংগ্রহ করে থাকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে
সংগ্রহ	• আবর্জনাসমূহ আবর্জনা ফেলার আশেপাশেই স্তুপ করে রাখা হয় • বর্জ্য সাধারণত: সংগৃহীত হয় বাড়ি বাড়ি থেকে খোলা গাড়ি বা কনটেইনারে করে, খোলা ট্রাকে করে ডাস্টবিন থেকে সংগ্রহ করে, ইত্যাদি • খোলা জায়গা থেকে
পরিবহন	• ট্রাক, কনটেইনার, ট্রাক্টর, ট্রেইলার ইত্যাদির সাহায্যে • দূষিত পর্দাথ বা ক্ষতিকারক বর্জ্য বিচ্ছিন্ন করা হয় না • স্থানান্তর একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়না
প্রক্রিয়াজাতকরণ	• অধিকাংশ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যেগে। বিশেষ করে যে সমস্ত বর্জ্যর অর্থনৈতিক মূল্য আছে সে সমস্ত প্রক্রিয়াজাত করা হয়, অবশিষ্টাংশের কোন ব্যবস্থা করা হয় না। • বর্তমানে স্থানীয় সরকারও সমন্বিত উদ্যেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে বর্জ্য সংগ্রহ, নিষ্কাশন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে • সাম্প্রতিক কালে কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে CDM(Clean Development Mechanism) প্রকল্প চালু করেছে যেখানে WWR নামে একটি ডাচ কোম্পানীকে ঢাকা নগরীর ৭০০ টন বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে
অগ্নিসংযোগ বা বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলা	যেহেতু এধরনের কাজে অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় এবং অনেক আর্দ্রতা সৃষ্টি করে তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্বজনাগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব হয় না।
জমি ভরাটকরণ	সাধারণত: খোলা জায়গায় স্তুপ করে রাখা হয় যেটা অস্বাস্থ্যকর এবং অকার্যকরী এবং পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যর জন্য হুমকী স্বরূপ। হাসপাতালের বর্জ্য, বিষাক্ত পর্দাথ, শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্যেও এভাবে ফেলে রাখা হয়।
ব্যয়	পৌরসভার মোট বাৎসরিক বাজেটের ৫- ২০% বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাসমূহঃ

বর্জ্য সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলোঃ

১. জাতীয় পর্যায়ে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকা

২. সঠিক নীতিমালা ও দিক নির্দেশনার অভাব

৩. অপর্যাপ্ত মূলধন এবং অপর্যাপ্ত কর আদায়

৪. পর্যাপ্ত জনগোষ্ঠী এবং অবকাঠামোর অভাব

৫. অসম্পূর্ণ বর্জ্য সংগ্রহ

৬. বিশাল জনগোষ্ঠীর তুলনায় পৌরসভাগুলোর পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যর্থতা

৭. জনসচেতনতার অভাব

৮. বর্জ্য স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অভাব

৯. সরকারী, বেসরকারী, এন.জি.ও, এবং ব্যক্তিগত উদ্যেগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা না থাকা।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে বর্জ্য সমস্যার সমাধানে বেশ কিছু পদক্ষেপ কার্যকরী এবং প্রশংসিত হয়েছে । এগুলোর মধ্যে একটা হলো **বিকেন্দ্রীকরণ।** এ ব্যবস্থায় ঢাকার কিছু কিছু স্থানে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্যেগে বর্জ্য সমস্যা সমাধানের উদ্যেগ নেয়া হয়েছে। পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশদূষণরোধ ইত্যাদি কল্পে ১৯৯৫ সালে ঢাকা নগরীতে বর্জ্যর কার্যকারী অংশটুকু পুনরুদ্ধারের জন্য একটা সচেতনতার সৃষ্টি করা হয়। কেননা আমরা যেসমস্ত পর্দাথ ফেলে দেই তাদের অধিকাংশেরই সবটুকু অকার্যকর হয়ে যায়না। পুন:প্রক্রিয়াজাত করলে এ সমস্ত বর্জ্য থেকেই আমরা আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করতে পারি বা এগুলোকে আবার ব্যবহারপযোগী করে তুলতে পারি। এই বিকেন্দ্রীকরণের মূল উদ্দেশ্য হল 4Rs নীতিমালা প্রণয়ন করা। অর্থ্যাৎ Reduce- বর্জ্য সংকোচন, Re-use- পুর্নব্যবহার, Recycle- প্রক্রিয়াজাতকরণ, এবং Recovery- পুনরুদ্ধার ইত্যাদি। এ প্রকল্পের অধীনে বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়, সুশৃংখল উপায়ে বর্জ্য সমূহকে বিন্যস্ত করা হয় এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সেগুলোকে আবার ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। এই ধরণের নতুন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন এবং সফল করতে ইউ.এন.ডি.পি'র সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (MoEF) ঢাকা নগরীতে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ পর্যায়ে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে বর্জ্য সমস্যা সর্ম্পকে সচেতনতা বাড়াতে সরকারী, বেসরকারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌথ উদ্যোগে একটি সমন্বিত কার্যক্রম শুরু করে যেখানে ঢাকা নগরীকে ৫টি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। ১৯৯৯ সালে সার্বজনীন সংস্থা (জনসাধারণ এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যৌথ সমন্বয়ে) এবং বেসরকারী সংস্থা (ম্যাপ এ্যাগ্রো) এর মধ্যে বর্জ্যসম্পর্কিত প্রকল্পসমূহকে বাস্তবায়ন করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পি.ডব্লিউ,ডি এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যৌথ প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ হলো:

- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার মধ্যস্থতায় একটি জমি অথবা যুক্তিসংগত জায়গা বরাদ্দ করা হবে এবং এর সাথে বেসরকারী সংস্থাও বর্জ্যসমূহ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত এবং বাজারজাত করবে।
- পি.ডব্লিউ,ডি এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এ সমস্ত জমি ব্যবহারের অনুমতি দেয়াসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। সাথে সাথে কম্পোস্টিং প্লান্টসমূহের জন্য পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- বর্জ্য ব্যবসা উৎসাহিত এবং গতিশীল করতে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করা হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা দেয়া হবে। বিশেষ করে এসব কর্মীদের মধ্যে যারা মহিলা তাদের বর্জ্য বিচ্ছিন্নকরণ, সংগ্রহ, কম্পোস্ট সার তৈরী এবং উৎপাদিত সার বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

বাংলাদেশে কম্পোস্ট সারের ভাল চাহিদা রয়েছে। বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়টা’কে পেশা হিসেবে উদ্বুদ্ধ করতে এ প্রকল্পের অধীনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য সার ব্যবসায়ী এবং নার্সারী মালিকদের সাথে যোগাযোগে সহায়তা করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি কেজি সার.০৫- .০৯ ডলার দরে বিক্রীর জন্য ম্যাপ এ্যাগরো লি. এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহ:

বিগত কয়েক বছর ধরেই বর্জ্য সমস্যার সমাধান এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য শহরগুলোতে কেন্দ্র করে বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কে সহায়তার জন্য JICA একটি বিশাল পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।
- প্রতিদিন ৭০০টন কম্পোস্ট তৈরী করতে পারে এমন প্লান্ট স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পটির জন্য সরকারী- বেসরকারী এবং সি.ডি.এম যৌথভাবে অর্থায়ন করবে।
- ইউনিসেফ ১৪টি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে কম্পোস্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে।
- ইউনিসেফের সহায়তায় ২৪টি সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে।
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ(LGED) এডিবির সহায়তায় বাংলাদেশের আটটি বৃহত্তম নগরীকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসবে।
- ইউ.এন.ডি.পি’র সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে Suitable Environment Management Program (SEMP) “Urban Solid Management Handling Rules of Bangladesh” নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

- এছাড়া Sustainable Environment Management Program (SEMP) এর আওতায় "Bio-medical Waste Handling Rules" নামের একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করা হবে।

যৌথ সংগঠনের ভিত্তিতে কম্পোস্টিং প্রোগাম চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য/ আর্বজনা সংগ্রহ করা হয়। বাড়ির লোকেরা বর্জ্য সংরক্ষণ করার সময় একটু সচেতনতা অবলম্বন করেন। আর্বজনা রাখার জন্য দুটো আলাদা পাত্র ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত দ্রব্য পচনশীল যেমনঃ খাদ্য-দ্রব্যের উচ্ছিস্ট অংশ, তরিতরকারীর খোসা বা ফেলে দেয়া অংশ, ইত্যাদি আলাদা রাখা হয়। এবং আলাদা পাত্রে অপচনশীল দ্রব্য যেমনঃ বোতল, কাঁচ, প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য রাখা হয়। প্রতিদিন ঢাকনাযুক্ত কনটেইনার বা বিশেষ ভ্যানে করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যেগে এগুলো করা হয় তাই এজন্য প্রতিটি বাড়ি থেকে নাম মাত্র কিছু অর্থ নেয়া হয়ে থাকে। রাজধানীর অনেক আবাসিক এলাকায় আজকাল এ পদ্ধতি চালু হয়েছে। পরবর্তীতে সংগৃহীত বর্জ্য থেকে পচনশীল বর্জ্যসমূহ আলাদা করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কম্পোস্ট প্রস্তুত করা হয়। আর্বজনা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যা দামে তুলনামূলক কম এবং জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সর্বোপরি এগুলো প্রাকৃতিক এবং পরিবেশ বান্ধব। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনসাধারণের কর্মের সংস্থান হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সিটি কর্পোরেশনগুলোর যা ব্যয় হয় তা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব পরিকল্পিত পদ্ধতির মাধ্যমে। বর্জ্যকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্হান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে। ঢাকা শহরের বিপুল পরিমান ভাসমান মানুষকে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশেষ করে রাজধানী ও এর আশেপাশের বস্তিগুলোর বেলায় **ব্যারেল টাইপ কম্পোস্টিং প্রজেক্ট** চালু করা যেতে পারে। কেননা নগরীর মোট জনসংখ্যার ৩০% বস্তিতে বসবাস করে। বস্তিবাসীর অসচেতন ভাবে আর্বজনা ফেলার কারণে নগরীর অনেক জায়গাতেই পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এখন আমরা জানবো এই **ব্যারেল টাইপ কম্পোস্টিং প্রজেক্ট** কি। **ব্যারেল টাইপ কম্পোস্টিং প্রজেক্ট** হলো কম্পোস্টিং এর একটি পদ্ধতি যেটা উদ্ভাবন করেছে শ্রীলংকার SEVANATHA. এই পদ্ধতির কিছুটা পরিমার্জিত করে ইউ.এন.ডি.পি'র Local Initiatives Facility for Environment (LIFE) প্রকল্পের সহায়তায় ঢাকা শহরের বস্তীবাসীদের জন্য এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প সফল হলে এটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। **ব্যারেল টাইপ কম্পোস্টিং** পদ্ধতিতে ঢাকনাযুক্ত একটি ২০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন লম্বা একটি সবুজ ব্যারেল বস্তিবাসীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। প্রতি ছয়টি পরিবারের জন্য একটি ব্যারেল প্রদান করা হয় এবং

এটিকে কংক্রীটের রিংয়ের বেষ্টনীতে ঘেরা উচুঁ পাকা জায়গায় স্থাপন করা হয়।ব্যারেলের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে বাতাস চলাচলের জন্য। প্রতিটি ব্যারেলের মূল্য (সংযোজন সহ) ১৮০০ টাকা(US $30)। বস্তিবাসীদের এর ব্যবহার এবং তাদের করণীয় সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ রান্নার কাজে উদ্ভূত বর্জ্য বা শাকসবজির উচ্ছিস্টাংশ এতে জমা করা হয়। তিনমাসের মধ্যে এসব আর্বজনা পচে যায়। বস্তিবাসীদের তাদের অপচনশীল বর্জ্যগুলোকে হলুদ রংয়ের ব্যারেলে রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। এই হলুদ ব্যারেলের বর্জ্যগুলো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি ২০০লিটারের ব্যারেল থেকে বছরে প্রায় ৯০০- ১০০০ টাকার কম্পোস্ট সার তৈরি সম্ভব। এভাবে বর্জ্য থেকে উৎপাদিত সার বিক্রী করে পরিবারের আয়ও বাড়ানো সম্ভব। অথচ একটু সচেতন হয়ে ব্যবহার করার ফলে এ থেকেই উর্পাজন সম্ভব। যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে পরিমাণটা সামান্য মনে হচ্ছে, কিন্তু চিন্তা করলে বোঝা যাবে সামগ্রিকভাবে এর পরিমাণটা অনেক। সর্বোপরি, পরিবেশ সুন্দর হচ্ছে, পরিচ্ছন্ন হচ্ছে, কারণ পূর্বে এ বর্জ্যগুলোই পরিবেশ নষ্ট করছিল। অর্থের চেয়ে যার আর্থিক মূল্য অনেক বেশী। যেখানে এ বর্জ্যগুলো থেকে কিছুই আমরা পাচ্ছিলাম না। আসলে অর্থ দিয়েও পরিবেশ সুন্দর করা যায় না যদি না আমরা সচেতন হই, সতর্ক হই। সাম্প্রতিক কালে ব্যারেল কম্পোস্টিং ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক কম্পোস্ট উৎপাদন করা হচ্ছে। এতে করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যেমন কর্মের সংস্থান হবে সাথে সাথে হ্রাস করবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয়িত অর্থ। তাছাড়া আমাদের দেশে সার সংকট বিদ্যমান। সারের অতিরিক্ত মূল্য, সরবরাহে অপর্যাপ্ততা, সময়মত সার না পাওয়া আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করছে। সময়মত সার না পাওয়ার ফলে এবং দাম বেশি হওয়ায় কৃষকরা আর্থিকভাবে লোকসান হচ্ছেন। ফলে ঘাটতি পুষিয়ে নিতে কৃষি দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে যা আমাদের সার্বিক জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারনে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, বিশেষ করে সীমিত আয়ের লোকজন বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

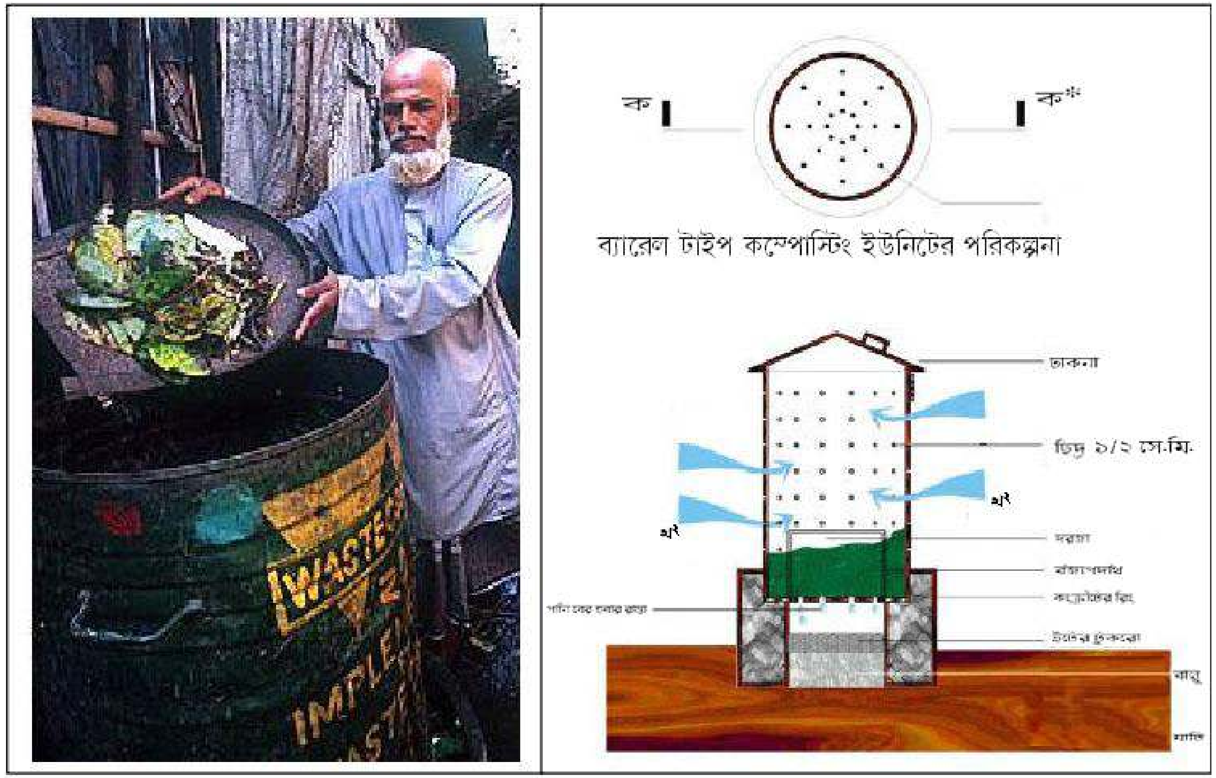

চিত্র: ব্যারেল টাইপ কম্পোস্টিং প্রকল্প

এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান বা এন.জি.ও। এদের মধ্যে Waste Concern এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৫ সালে এ.এইচ.এম মাকসুদ সিনহা এবং ইফতেখার এনায়েতউল্লাহ এর যৌথ উদ্যোগে Waste Concern নামে একটি এন.জি.ও গড়ে তোলা হয়। মূলত: সরকার, বেসরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় এলাকার সহায়তায় ঢাকা শহরের বর্জ্য সমস্যা সমাধানে এই এন.জি.ও টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউ.এন.ডি.পি এবং ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত এ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২০ জন। এই Waste Concern এর মূল লক্ষ্য হলো বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন, বর্জ্য

ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা করা এবং বর্জ্য সমস্যার সমাধান করা। এছাড়া সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় জনগণ এবং পৌরসভার যৌথ সমন্বয়ে নগরের পরিবেশের উন্নয়ন করা। সর্বোপরি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ব্যারেল কম্পোস্টিং ছাড়াও অত্যাধুনিক আরেকটি পদ্ধতিতে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করা যায়। সেটি হলো উইন ড্র কম্পোস্টিং (windraw composting)। এটি একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প। এ পদ্ধতিতে অর্গানিক বর্জ্যগুলোকে (যেমনঃ এ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক প্রভৃতি) একটি লম্বা সংকীর্ণ টানেলের মাধ্যমে একটি চুল্লিতে স্থাপন করা হয় সরু যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করে বর্জ্যগুলোকে উচ্চ তাপমাত্রায় গুঁড়ো করে ফেলা হয়। এজন্য এ্যারোবিক উইনড্র কম্পোস্টিং (Aerobic windraw composting) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিটি ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক আবিষ্কৃত। এ পদ্ধতিতে বর্জ্যগুলোকে প্রথমে ভ্যানে বা কনটেইনারে করে বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এরপর বর্জ্যগুলোকে ছায়াযুক্ত একটি স্থানে স্তূপীকৃত করা হয় এবং এতে উপকারী মাইক্রোঅর্গানিজম বা অণুজীব প্রয়োগ করা হয়। পাইল বা স্তূপের উপরের অংশ ছাউনি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে যেন স্তূপের ভেতর পানি প্রবেশ না করতে না পারে । এ ছাউনি কর্মীদের রোদ- বৃষ্টি থেকেও রক্ষা করে । এ্যারোবিক কম্পোস্টিং পদ্ধতিতে স্তূপের ভেতর তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় ৫৫ থেকে ৬৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। অণুজীবগুলো যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন পায় সেজন্য স্তূপের ভেতর বাঁশের দ্বারা বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশসমূহে স্তূপগুলোতে অত্যধিক তাপ পাবার সম্ভাবনা থাকে। বাঁশগুলো সাধারণত স্তূপের ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পানি সরবরাহ সুবিধাসহ বর্জ্যগুলোর দ্রুত পচন নিশ্চিত করে যা অণুজীব/ব্যাকটেরিয়াগুলোর জন্য নতুন খাবারের উৎস তৈরী করে। বর্জ্যগুলোকে কখন ওলটপালট করতে হবে স্তূপের তাপমাত্রা তা নির্ধারণ করে । তাপমাত্রার গতি নির্ধারণের জন্য তাপমাত্রা প্রত্যক্ষ করে রের্কড করা হয়/লিখে রাখা হয়।এ্যারোবিক পদ্ধতিতে র্কাবন এবং নাইট্রোজেনের পরিমানের হার সর্বোচ্চ ৩৫- ৫০ ধরা হয় কিন্তু ঢাকাতে এর পরিমাণ সামান্য বেশি (কার্বন ২২.৬% এবং নাইট্রোজেন ০.৪১%)। এ প্রকল্পে মুরগী এবং গবাদী পশুর মলমূত্র থেকে উৎপাদিত সার নাইট্রোজেনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আরো বেশি বাতাস চলাচলের জন্য কাঠের গুঁড়া ও কম্পোস্টের মিশ্রণের সাথে মেশানো হয়। এ পদ্ধতিতে সামান্য দূর্গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং কম্পোস্ট পচতে ৪০ দিন লাগে। ১৫ দিনে কম্পোস্ট সম্পূর্ণ তৈরী হয়। এরপর মিশ্রণটিকে বড় চালুনীর সাহায্য ছেঁকে বাড়তি ময়লা ফেলে দেয়া হয় এবং বাজারজাত করার জন্য প্যাকেট করা হয়। সম্প্রতি ওয়াস্ট কনসার্ন চেষ্টা করছে কম্পোস্ট উৎপাদনের মোট সময়কে ৪০ দিনে নামিয়ে আনতে। বর্তমানে প্রায় দুই টন বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে প্রতিদিন ৫০০ কেজি কম্পোস্ট সার উৎপাদন করা হয়। এ ধরনের

প্লান্টগুলোতে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেশী। ফলে দেশের দরিদ্র মহিলাদের র্কমসংস্থান হচ্ছে। মেয়েদের পাশাপাশি পুরুষরাও এখানে কাজ করে। ফলে বেকারত্বের হার কমছে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত সমাজের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাছাড়া দেশে যে পরিমাণ সারের চাহিদা তা পর্যাপ্ত পরিমানে কম্পোস্ট উৎপাদনের মাধ্যমে অনেকাংশেই মেটানো সম্ভব।

চিত্র: উইনড্র কম্পোস্ট প্রজেক্ট

বর্জ্য সমস্যা এবং আমাদের করণীয়:

যে কোন সমস্যা সমাধানের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হলো সচেতনতার অভাব যেটা আমাদের মধ্যে আছে। শুধু আছে বললে ভুল হবে বেশ ভালভাবেই আছে। তাই পরিবেশ দূষণ, নগরায়ন কিংবা বর্জ্য যাই বলি না কেন সব ক্ষেত্রেই প্রথমে প্রয়োজন সচেতনতা। যেখানে সেখানে যত্রতত্র ময়লা ফেলা যাবে না। চোরগুলোকেও একটু স্বভাব বদলাতে হবে যেন ডাস্টবিন/ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি না করে। যে সমস্ত দ্রব্য পূর্ণ ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে।

যে সমস্ত বর্জ্য দহনযোগ্য বা পচনশীল যেমনঃ রান্নাঘরের যাবতীয় উচ্ছিষ্ট, গাছপালার ডাল/পাতা, ঘাস, ছোট ছেড়া কাগজ, চামড়ার ছোট বস্তু, জুতা, স্যান্ডেল, ছোট কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি বর্জ্যভূমিতে (landfill) বা সহজ ভাষায় মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ ব্যবস্থা বেশ কার্যকরী)। কারণ কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই এগুলো পচে নিরাপদ মাটিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রচলিত এই পদ্ধতিতে পচনকালে কিছু মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অপরপক্ষে এই ময়লাগুলোকে পুড়িয়ে ফেললে এ থেকে উৎপন্ন ছাইয়ের পরিমান/আয়তন মূল আবর্জনার প্রায় এক দশমাংশে কমে আসে। ফলে ঐ ছাই নিষ্কাশনের ফলে বর্জ্যভূমিতে চাপ কম পড়ে আর

এগুলো সেখানে পরিবর্তিত হয়ে নিরাপদ মাটিতে পরিবর্তনের সময় তেমন ক্ষতিকারক গ্যাসও উৎপন্ন হয় না।

পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় বস্তুগুলো পুড়ালে এ থেকে ক্ষতিকারক কিছু ক্ষতিকারক গ্যাস উৎপন্ন হয় (কার্বন ডাই-অক্সাইড) যা মারাত্মক বায়ু দূষণ করতে পারে। তাছাড়া এগুলো সহজে পচনশীল দ্রব্য নয়। তাই মাটিতে বা বর্জ্যভূমিতে ফেললেও এগুলো সহজে নিরাপদ মাটিতে পরিনত হবে না বরং জমা হয়ে থাকবে। তাই প্লাস্টিক বা পলিথিন বস্তুগুলোকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করে পূণরায় ব্যবহারোপযোগী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া পলিথিন ব্যাগ, যে কোন পলিথিন জাতীয় প্যাকেট/দ্রব্য, প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থে তৈরী যে কোন বোতল (তেল, শ্যাম্পু ইত্যাদি) বা বস্তু এজাতীয় পদার্থের মধ্যে অন্তর্গত। যে কোন প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ ফেলার আগে সেগুলো ভাল করে ধুয়ে তারপর ফেলতে হবে।

বিভিন্ন ছোট ধাতব পদার্থ, যেমন কোল্ড ড্রিংকসের ক্যান, টিনজাত খাবারের ক্যান এবং কাঁচের বোতল ইত্যাদি আলাদাভাবে ফেলতে হয়। তবে ফেলার সময়ে এগুলোর গায়ে কোন লেবেল লাগানো থাকলে সেগুলো তুলে ফেলতে হয়। এগুলো আমরা পুড়িয়ে ফেলতে পারি। বোতলের মুখগুলো ধাতব না হলে সাধারণত প্লাস্টিক হিসেবে ফেলতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোল্ড ড্রিংকসের বোতলগুলো সাধারণত PET বোতল হিসেবে আলাদা ভাবে ফেলতে হয়। বোতলগুলোর লেবেলে সেটা PET বোতল কি না লেখা থাকে। বোতলগুলো ঐ প্রকৃতির হলেও বোতলের ক্যাপ/মুখগুলো কিন্তু প্লাস্টিক ময়লার সাথে ফেলতে হয়। আর বোতলের লেবেলগুলোও ছিঁড়ে আলাদাভাবে ফেলতে হয় - প্লাস্টিক বা দহনযোগ্য হিসেবে।

পৌরসভাগুলোকে ঢাকনা যুক্ত কনটেইনার ব্যবহার করতে হবে । ড্রেনগুলো পরিষ্কারের পর সে বর্জ্যগুলো সাথে সাথে সরিয়ে ফেলতে হবে। সংগৃহীত আর্বজনা শহর থেকে দূরে ফেলতে হবে।

শিল্প কারখানাগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট তৈরী করতে হবে। যে সমস্ত নদী বর্জ্যোর কারণে স্রোতহীন হয়ে পড়েছে, নিয়মিত ড্রেজিং এর মাধ্যমে সেগুলোর প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে হবে।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি আমরা বর্জ্যগুলোকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারি। সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরো বেশি বেশি কম্পোস্ট প্লান্ট গড়ে তুলতে হবে। অপচনশীল বর্জ্য ধ্বংস করতে যে পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে তা অনেক ব্যয় সাধ্য। তাই সবকিছুর আগে ও পরে আমাদের সবসময়ই সচেতন হতে হবে।

দিনের সূর্য্য তার বিছানা বালিশ গোটাতে ব্যস্ত,যাবার সময় হয়েছে। এখন চাঁদের পালা। ছমীরন ও আজ একটু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে। বাজারে যেতে হবে। কম্পোস্ট প্লান্ট থেকে বাজার বেশ অনেকটা পথ। সূর্য্য ডুবে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল কোথায় ছিল, আর আজ কোথায় এসেছে। শহরের আবহাওয়ায় তার প্রাণটা মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। বুক ভরে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সারাদিনের কর্মব্যস্ত দিন শেষে রাতের আঁধারটুকু কাটে বস্তির নোংরা ছায়ায়। সেখানেও আঁধার.......চারপাশে ডাস্টবিন থেকে ভেসে আসা দূর্গন্ধ, মশা- মাছি, চিৎকার চেঁচামেচি। বিল্ডিং নামের সিমেন্ট- বালুর প্যাকেট গুলো দেখতে দেখতে ছমীরন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে খোলামাঠ। নিজেকে মনে হয় আকাশ থেকে নেমে আসা কোন পরী, যে সমগ্র মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে কল্যাণের বার্তা প্রকৃতির দূত হয়ে। নিয়নের আলো ঢেকে দেয় তার ছেঁড়া শাড়ির দৈন্যতা, উজ্জ্বল আলোয় বিবর্নতাগুলো চাপা পড়ে যায়। মনে মনে বলে ওঠে-

"এই যে মানুষেরা, তোমরা শোন, নগরায়ন মানে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়া নয়, গ্রামগুলোকে অবহেলায় ফেলে রেখে একটা ঘরকে উঠোন বানানো নয়। নদীগুলোকে বর্জ্যের নোংরা আবরণে নষ্ট করা নয়। তোমরা গ্রামগুলো সাজাও তোমাদের মনের মত করে। যেমন করে তোমরা সাজাও তোমাদের শহরের বাড়িঘর। নতুন নতুন কারখানাগুলো শহর থেকে বাইরে গড়ে তোলো। গ্রামে গ্রামে গড়ে তোল ক্ষুদ্র- মাঝারী শিল্প। যে নরম হাতে আমরা হাঁড়ি- পাতিল নাড়ি সে হাতগুলোকেও কাজে লাগাও। আর তোমাদের শক্ত হাতগুলোকেও। আধুনিকতার ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দাও গ্রাম গুলো। বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ো সারা দেশে। পড়ে থাকা সবকিছু হোক না জমি, হোকনা খাল, হোকনা বর্জ্য যা কিছু পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে সবকিছুকে কাজে লাগাও, সচেতন হও। তোমাদের মেধাকে দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করো। দেখবে সারা দেশটাই পরিণত হয়েছে একটা বিশাল নগরীতে, আমি চললাম....."

আহ্.........একটা সুতীব্র আর্তনাদ। তারপর কলার খোসায় পা পিছলে ছমীরনের পাশের খোলা ম্যানহোলে পড়ে যাওয়ার শব্দ শহরের কোলাহলে চাপা পড়ে যায়। এই হলো আমাদের নগরজীবন, আমরা কবে যে সচেতন হবো।

“গ্রাম্য চাষা”- দের বিদ্যুৎ উৎপাদনের গল্প

শাবাব মুস্তাফা

ফাইয়াম (Freiamt) , জার্মানী।

ব্ল্যাক ফরেস্টের মাথা উপর দিয়ে সুর্যের আলো পুব আকাশে রংয়ের ছোঁয়া লাগাতে না লাগাতেই হেলগা স্নাইডার বিছানা ছাড়লেন। দ্রুত হাতে কাজের পোষাক পড়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন গোয়াল ঘরের দিকে, যেখানে তার দুধেল গাইগুলো অপেক্ষা করছে। গাভীগুলোকে বের করে একটু ধুইয়ে গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হলেন দুধ দোয়াবার জন্য। এরপর রবারের হোসগুলো গরুর বাঁটে লাগিয়ে মেশিনটা চালু করে দিতেই রবারের পাইপ ধরে শোঁ শোঁ করে দুধ জমা হতে থাকল একটা কপারের পাত্রে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডজনখানেক গাভীর দুধ সংগ্রহ সম্পুর্ণ হল। খুশিমনে হেলগা বাড়ির পথ ধরলেন। সকাল সকাল তার দুধ দোয়াবার কাজ শেষ হয়েছে।

এই চিত্র জার্মানীর কোন শিল্প এলাকার নয়। নয় কোন ব্যস্ত শহরতলীর। এ চিত্র জার্মানীয় পুর্ব উপকূলের কৃষি প্রধান ছোট্ট এক গ্রাম্য- শহর ফাইয়ামের। বিদ্যুতের কল্যাণে ফাইয়ামের সাধারণ কৃষক পরিবারগুলোর জীবনে লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। সহজ হয়েছে জীবন। তারচেয়েও বড় কথা, ফাইয়ামবাসী এখন তাদের নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নিজেরাই। শুধু তাই নয়, নিজেদের প্রয়োজনের মিটিয়ে তাদের মোট উৎপাদনের প্রায় ১৭% উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ তারা যোগান দিচ্ছে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে। অবদান রাখছে জাতীয় অর্থনীতিতে।

যেভাবে শুরু

ঘটনার শুরু নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে, যখন হামবুর্গের একদল বিনিয়োগকারী ফাইয়ামে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি ইজারা নিতে এল। কিন্তু শুরুতেই বাধল বিপত্তি। ফাইয়ামবাসীরা বাইরের ব্যবসায়ীদের কাছে জমি দিয়ে ফাইয়ামের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে মধ্যসত্ত্বভোগীদের মুনাফা লুটে নিতে দিতে রাজি হল না। বরং ঘটনা ঘটল উল্টো। স্থানীয় অধিবাসী আর্নস্ট লাইমার, যিনি এখন সেখানকার বায়ু শক্তি সমিতি- র প্রধান, ছোট একটি দল নিয়ে প্রথম সেখানকার বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। তারা সম্ভাব্য পয়েন্টগুলোতে বায়ু শক্তি মাপার জন্য পর্যবেক্ষণ

খুঁটি স্থাপন করতে লাগলেন। সেইসাথে চলল টাউন হলের দরবার যেখানে সকল ফাইয়ামবাসীরা এসে এই বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে তাদের মতামত বিনিময় করত। এভাবেই ধীরে ধীরে ফাইয়ামে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আকার পেতে শুরু করল।

পরিকল্পনা যখন প্রাথমিক পর্যায়ে তখন স্থানীয় কিছু লোক এর বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের ধারণা ছিল ফাইয়ামে বড় বড় উইন্ডমিল স্থাপন করলে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হানি হবে এবং পর্যটন শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তবে যাই হোক সে আপত্তি আর শেষতক ধোপে টেকেনি।

শীঘ্রই যখন পর্যবেক্ষণ খুঁটিগুলো ইতিবাচক ফলাফল দিতে শুরু করল তখন লোকজনের মনে সঞ্চারিত হল ব্যাপক উৎসাহ। ২০০১ সালের মাঝামাঝি মাত্র ৮ সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের জন্য সংগৃহীত হল ২.৩ মিলিয়ন ডলার, যার পুরোটাই এল সেখানকার স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে।

২০০১ সালের শেষভাগে ফাইয়ামে স্থাপিত হল ৪০০ ফুট উঁচু দুটো উইন্ডমিল। আর সেগুলো যখন ঘুরতে শুরু করল আলো জ্বলল জার্মানির প্রায় ১৬০০ বড়িতে। মাত্র দু বছরের মধ্যেই এই প্রকল্পের বিনিয়োগকারীগণ বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে মুনাফা পেতে শুরু করলেন। অবশ্য এর পেছনে জার্মানির ফিড- ইন ট্যারিফ নীতিরও একটা ভূমিকা ছিল। এই নীতি অনুসারে বিদ্যুৎ গ্রিড অপারেটরগণ নবায়নযোগ্য মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সাধারণ হারের চাইতে বেশি দামে কিনে থাকে।

এখানেই শেষ নয়, প্রাথমিক প্রকল্পের সাফল্যের পর ২০০৩ সালে লাইমার ও তার দল তৃতীয় উইন্ডমিল এবং সেইসাথে আটটি সৌরচালিত ফটোভোল্টিক জেনারেটর স্থাপনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। লাইমার আর তার দল যখন সৌর প্যানেল বসাবার জন্য লোকজনের বাড়ির ছাদ ভাড়া করার জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন তখন ঘটল মজার ঘটনা। কেউই তার ছাদ ভাড়া দিতে রাজি নয়। ততদিনে তারা ঢের সচেতন। তাদের সাফ কথা, 'আমার ছাদে তো আমি নিজেই সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি। মিছেমিছি তোমায় ভাড়া দিতে যাব কেন বাপু?!' এভাবেই হল ফাইয়ামের নতুন দিনের শুরু।

পরিবেশ বান্ধব শক্তি

ভাবছেন এখানেই শেষ? ভুল। এখানেই শেষ নয়। ফাইয়ামে অধিবাসীদের চোখের সামনে ততদিনে খুলে গেছে অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার। ধীরে ধীরে ফাইয়ামে স্থাপিত হতে লাগল বায়োগ্যাস প্লান্ট, যেখানে গো-বর্জ্য দিয়ে বায়োগ্যাস আর বায়োগ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। বাড়ির ছাদে বসল সৌর প্যানেল। আদ্দি আমলের ওয়াটার হুইলগুলো পুরোনো ময়দার মিলের গম পেষাইয়ের যাঁতা ঘোরানো বাদ দিয়ে ঘোরাতে লাগল বিদ্যুৎ জেনারেটরের টারবাইন। পুরো ফাইয়ামে যেন নেশা লেগে গেল বিদ্যুৎ উৎপাদনের। আর এই বিদ্যুতের সবটাই উৎপন্ন হচ্ছে নবায়নযোগ্য আর পরিবেশবান্ধব শক্তি

উৎস থেকে। ফাইয়ামে অধিবাসীরা পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করল এক নতুন ইতিহাস।

ছবি: ফাইয়াম গ্রামের উইন্ডমিল
(ছবি তুলেছেন মারিয়াহ ব্লেইক)

বর্তমানে ফাইয়ামের মাথার উপর ঘুরছে চারটি উইন্ডমিল যা সৌন্দর্যের হানি তো করেইনি বরং যোগ করেছে বাড়তি শোভা। ২৫০টি বাড়ির ছাদে বসেছে সৌর প্যানেল যা সাধারণ বিদ্যুৎ চাহিদা আর শীতকালে ঘর গরম রাখার হীটার চালাবার কাজ করতে পারে হেসেখেলে। কেউ কেউ আবার পুরানো ওয়াটার হুইলগুলোকেই (ঝর্ণা, ক্রিক, নালা ইত্যাদির পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘোরানোর যন্ত্র) বানিয়ে নিয়েছেন বিদ্যুৎ তৈরির জন্য শক্তির মাধ্যম, যাতে ছোটখাট শিল্প কারখানাও চলছে।

গত বছর ফাইয়ামে উৎপন্ন হয়েছে ১৪.৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ যা এর নিজের চাহিদা থেকে ২.১ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা বেশি। এই অতিরিক্ত বিদ্যুতে জার্মানির কমপক্ষে ৬০০ বাড়িতে আলো জ্বলেছে।

ফাইয়ামের এই নবায়নযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে ফাইয়ামের হিরো মি. লাইমারের বক্তব্য বেশ সোজাসাপ্টা, “এরকম বহুলোক আছে যারা জানে যে পরিবেশ রক্ষার জন্য তাদের কিছু না কিছু করার আছে কিন্তু কাজের বেলায় কেউই কিছু করে না। এই ব্যাপারে আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা এখানে আমরা যা করেছি তা শুধু আমাদের পরিবেশ আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যই করিনি, সেইসাথে নিজেদের জন্যও করছি।”

লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া, বদলে গেছে আর্থ- সামাজিক অবস্থা

বিদ্যুতের ব্যবহার সহজ করেছে ফাইয়ামবাসীর জীবন। দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোয় লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ নির্ভর ছোট ছোট কারখানা। শুধু তাই নয় উৎপন্ন বিদ্যুতের উদ্বৃত্ত অংশ জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করেও উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছেন তারা। এই রকমই একটি কারখানা The Mellert bakery and gristmill। চারতলা উঁচু এই কারখানায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এর নিজস্ব ওয়াটার হুইল। জলস্রোতের শক্তি ব্যবহার করে এই ওয়াটার হুইল ঘোরায় টারবাইন যা উৎপন্ন করে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুতেই গরম হয় বেকারির ওভেনগুলো। ঘোরে Gritsmill (ময়দা মিল) - এর চাকা।

এই বেকারির মত একই রকম জলবিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে গোৎলিব রাইনবোল্ডের করাত কলেও। ভরা মৌসুমে মি. রাইনবোল্ড তার করাত কলের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের পর অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ বাবদ মাস প্রতি মাস আয় করেন ৮৮০ ডলারের মত। এ ব্যাপারে রাইনবোল্ডের মত, "অংক হয়ত খুব বেশি নয়, তবু মোটামুটি চলে যাচ্ছে।

ছবি: গোয়ালঘরে কাজ করছেন হেলগা স্নাইডার (ছবি তুলেছেন মারিয়াহ ব্লেইক)

স্নাইডারের পরিবার তাদের গরুগুলোর দুধ পাস্তুরিত করার জন্য ব্যবহার করেন আধুনিক zero-emission wood-chip boiler. এই চুল্লী জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে উচ্ছৃষ্ট কাঠের টুকরা। সেইসাথে তাদের ফার্মহাউজের ছাদে বসানো বিলবোর্ড সাইজের ফটোভোল্টিক সৌর প্যানেলগুলো প্রতিবছর উৎপন্ন করে ৩০,০০০ কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ যা স্নাইডার পরিবারের বাৎসরিক চাহিদার দ্বিগুণ। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করে আয় হয় বছরে প্রায় ২৪,০০০ ডলার।

এই বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ফাইয়াম যে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষভাবেই লাভবান হয়েছে তা কিন্তু নয়। অবকাঠামোগত পরিবর্তন ফাইয়ামের ইকো-ট্যুরিজমেও এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রতি বছর ৪২,০০০ হাজারেরও বেশি পর্যটক ফাইয়ামে আসেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে। তাদের পর্যটনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে ফাইয়ামের উইন্ডমিলগুলো পর্যবেক্ষণ। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই উইন্ডমিলগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য পথপ্রদর্শনে নেতৃত্ব দেন সেইসব অধিবাসীরা যারা কিনা শুরুতেই এই প্রকল্পকে ভেটো দিয়েছিলেন।

উপসংহার

আধুনিক প্রকৌশল এবং আন্তরিক চেষ্টায় খুব সহজেই পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদন এবং সেই শক্তি ব্যবহার করে ভাগ্যের চাকার ঘোরানোর যে সম্ভব সেটা ফাইয়াম পৃথিবীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। ফাইয়ামের এই প্রকল্পে যারা সন্দিহান ছিলেন তাদের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে ফাইয়ামের অধিবাসীরা। ফাইয়ামের মেয়র রাইনবোল্ড-মেনচ অতীত স্মৃতি টেনে বলেন, "লোকে এক সময় আমাদের কাজকর্ম দেখে হাসত। তাদের চোখে আমরা ছিলাম স্রেফ গ্রাম্য চাষার দল। এখন তারাই উৎসাহ নিয়ে দেখতে আসে আমাদের এখানে কি করছি। আমাদের ছোট্ট ফাইয়ামের জন্য এটা অনেক বড় গর্বের বিষয়।"

(দ্য ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরে প্রকাশিত মারিয়াহ ব্লেইকের প্রবন্ধ অবলম্বনে অনুলিখিত)

[প্রজন্মান্তরে বিজ্ঞান ভাবনা]

জৈব জ্বালানী: সম্ভাবনা, নাকি সংকট?

--বিপ্র রঞ্জন ধর

ক্রমবর্ধমান জ্বালানী সংকট এড়াতে সারা বিশ্বজুড়েই এখন বিকল্প জ্বালানী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানীর বিপরীতে এসব বিকল্প জ্বালানীর ক্ষেত্রে যে দুটি বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তা হলো- এগুলো নবায়নযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব কিনা। এই বিকল্প জ্বালানীগুলোর মাঝে সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে আলোচিত এবং সমালোচিত হচ্ছে জৈব জ্বালানী (Biofuel)। এই জৈব জ্বালানীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে, এর ব্যবহার বিশ্বজুড়ে চলমান খাদ্যসংকট সৃষ্টি করছে। জৈব জ্বালানীর কথা শুনলে ইদানিং অনেকেই সাথে সাথে ভ্রু কুঁচকে ফেলেন, মানুষ খেতে পায় না আর খাবার দিয়ে জ্বালানী? একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জৈব জ্বালানী ব্যবহারের বেশ কিছু নেতিবাচক দিক আছে। তবে এর ইতিবাচক দিকও কিন্তু কম নয়। এবং চাইলে এর নেতিবাচক দিকগুলো কাটিয়ে উঠাও অসম্ভব কিছু নয়। তাই জৈব জ্বালানীর ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি এই লেখায় এর নেতিবাচক দিকগুলো কিভাবে কাটানো যায় সেই বিষয়গুলোও কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই দেখা যাক, জৈব জ্বালানী কি এবং কেন। জৈব পদার্থ থেকে সৃষ্ট জ্বালানীকেই জৈব জ্বালানী বলা হয়। সেই জৈব পদার্থটির উৎস উদ্ভিদ বা প্রাণী হতে পারে। আমরা জানি, সব শক্তিই কোন না কোনভাবে সূর্য থেকে আসে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উদ্ভিদ সূর্যের আলোতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তার খাদ্য তৈরি করে। খাবারের মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে সেই রাসায়নিক শক্তিটুকু প্রাণীতে স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ থেকে জৈব জ্বালানী তৈরি করলে সেই রাসায়নিক শক্তিটুকুই জ্বালানী হিসেবে কাজ করে। সুতরাং, জৈব জ্বালানীর উৎসও পরোক্ষভাবে সূর্য। এ সময়ের বহুল ব্যবহৃত জৈব জ্বালানীগুলো হচ্ছে- বায়োইথানল, বায়োডিজেল, বায়োগ্যাস ইত্যাদি। খাদ্যশস্য ব্যবহার না করেও জৈব জ্বালানী তৈরি করা সম্ভব।

জৈব জ্বালানীর কথা আসলে সবাই প্রথমেই টেনে আনেন বায়োইথানলের কথা। কারণ বিষয়টি কিছুটা সাম্প্রতিক। বায়োইথানল উৎপাদনকারী দেশগুলোর মাঝে শীর্ষস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। উল্লেখ্য, ব্রাজিলে ইক্ষু থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বায়োইথানল উৎপাদন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের বায়োইথানল উৎপাদন সম্পর্কিত একটি চুক্তির পরপরই মূলত এই বিতর্কটি সারাবিশ্বে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির দায়ভার এই জৈব জ্বালানীর ঘাড়েই চাপানো হচ্ছে। বিষয়টি পুরোপুরি মিথ্যে নয়। গত বছরে জুলাই মাসের শুরুতে ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা দাবি করে, বিশ্বব্যাংকের এক গোপন রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্য থেকে জৈব জ্বালানী তৈরি একটি বড় কারণ। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদন খুব একটা কমেছে এমন কোন কথা খুব একটা শোনা যায়নি। বেশির ভাগ দেশেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন আগের মতোই স্বাভাবিক। এবং কৃষি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশেই বাম্পার ফলনের কথাও শোনা যায়। তবু কেন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে? জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগও সেক্ষেত্রে বড় কারণ। এছাড়া অনেক দেশ সাম্প্রতিককালে খাদ্য মজুদের অজুহাতে রপ্তানির পরিমান কমিয়ে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এই খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি। পরিস্থিতিটা হয়তো একজন অর্থনীতিবিদ অনেক ভালো ব্যাখ্যা করতে পারবেন। তাহলে এই খাদ্য এই ঘাটতি বা খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাবার দায়ভার প্রায় পুরোটাই জৈব জ্বালানীর ঘাড়েই কেন চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে? এর উত্তর খুঁজতে সবার মতো রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির দিকে আমি বেশি যাবো না। কিংবা তেমন কোন পরিসংখ্যানও তুলে ধরবো না। কারণ, এ ধরনের পরিসংখ্যান ইন্টারনেট খুঁজলে হাজারখানেক পাওয়া যাবে। বরং খাদ্য সংকট সৃষ্টি না করেও যে জৈব জ্বালানী একটি দেশের সম্ভাবনাময় বিকল্প জ্বালানী হয়ে উঠতে পারে তার প্রযুক্তিগত দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

এই জৈব জ্বালানী বিতর্কে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে তা হলো শুধুমাত্র খাদ্যশস্যই জৈব জ্বালানীর উৎস নয়। আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেয়া প্রতিদিনের উচ্ছিষ্ট পদার্থ থেকে জৈব জ্বালানী তৈরি করা সম্ভব। এমনকি বর্জ্য পানি (Wastewater) থেকেও বায়োগ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব। তবে বায়োগ্যাস ছাড়া অন্যান্য জৈব জ্বালানীর কাঁচামাল মূলত উদ্ভিদ বা খাদ্যশস্য থেকেই আসতো। তবে প্রযুক্তি মাত্রই পরিবর্তনশীল। এখন খাদ্যশস্যের বদলে পশুচর্বি, এমনকি ডোবায় জন্মানো শৈবাল থেকেও জৈব জ্বালানী তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদনে কোন ধরণের প্রভাব পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে এখনও বেশ কিছু দেশ অনেকটা বোকার মতো খাদ্যশস্য থেকে জ্বালানী তৈরির মতো এই আত্মঘাতী কাজটি করে যাচ্ছে। কোন কোন দেশে কৃষকদের বেশি লাভের লোভ দেখিয়ে শক্তিশস্য (Energy Crop) উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আর এভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে খাদ্য ঘাটতি, সাথে বাড়ছে দাম। জৈব জ্বালানী তৈরির বিকল্প উৎসগুলোকে ঠিকঠাকমতো কাজে লাগাতে পারলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

শক্তি এবং পরিবেশ- দুটি বিষয় নিয়েই এখন বিশ্বজুড়ে মাতামাতি। তাই শক্তির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জৈব জ্বালানীর ব্যবহারে পরিবেশের উপর কেমন প্রভাব পড়ছে সেটাও ভেবে দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জৈবজ্বালানী নিয়ে আরো একটি অভিযোগ হলো, কিছু কিছু জৈব জ্বালানীর ব্যবহারে প্রচুর পরিমান গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয় এবং তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। ব্যাপারটি পুরোপুরি মিথ্যা নয়। যেমনঃ বায়োডিজেল তৈরিতে ব্যবহার করা হয় অ্যালকোহল। এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত অ্যালকোহলটি হচ্ছে মিথানল। মিথানল খুবই বিষাক্ত। সাধারণত জৈব জ্বালানী তৈরির সময় বিক্রিয়াটি যেন ভালোভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য অতিরিক্ত পরিমান মিথানল ব্যবহার করা হয়। এর ফলে বেশ কিছু মিথানল রয়ে যায় যা জৈব জ্বালানী থেকে পুরোপুরি আলাদা না করতে পারলে তা পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে। বেশির ভাগ প্রচলিত পদ্ধতিতে মিথানল জৈব জ্বালানী থেকে ভালোভাবে আলাদা করা হয় না। ফলে জ্বালানীতে কিছু মিথানল থেকেই যায় যা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ধরনের ত্রুটিগুলো দূর করাটাও জরুরী। এছাড়া উচ্ছিষ্ট তেল বা চর্বি থেকে জৈব জ্বালানী উৎপাদনে বেশকিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা আছে। এ ধরনের উৎসে মুক্ত ফ্যাটি এসিডের পরিমান বেশি থাকায় উৎপাদন প্রক্রিয়াটি অনেকখানি জটিল হয়ে যায়। মানুষ যদি মঙ্গলে বসতি গড়ার স্বপ্ন দেখতে পারে তবে এসব জটিলতা দূর করাটাও অসম্ভব কিছু নয়। বরং তার তুলনায় অনেকটা সহজই হবে, আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষকরা সেই চেষ্টাই করছেন।

একথা ঠিক যে শুধুমাত্র জৈব জ্বালানী দিয়ে এককভাবে পৃথিবীর শক্তির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ দেশেই প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানীর সাথে জৈব জ্বালানী মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এবং এ দিয়ে আমাদের চাহিদার একটি অংশ পূরণ করা করা যেতে পারে। বর্তমানে সারাবিশ্বে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প জ্বালানী নিয়ে গবেষণা চলছে। সব দেশের জন্য সবগুলো সুবিধাজনকও নয়। একটি ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যাক। যেমনঃ ভূ-তাপীয় শক্তি (Geothermal Energy) কোন দেশ চাইলেই ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ সেটি পুরোপুরি ভৌগলিক অবস্থানের উপরে নির্ভর করছে। তাই প্রত্যেকটি দেশকেই তার সবকিছু বিবেচনা করেই সুবিধাজনক বিকল্প জ্বালানীটি বেছে নিতে হবে। আমাদের বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে বাতাসের গতিবেগ সারাবছর একই রকম না থাকায় বায়ুশক্তিকেও ব্যবহার করা সম্ভব নয় বলে বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে। অবশ্য কিছু সাম্প্রতিক গবেষণায় আবার ইতিবাচক তথ্যও পাওয়া গেছে। যাই হোক, ভূ-তাপীয় শক্তি কিংবা বায়ুশক্তি ব্যবহার করা যাবে না বলে কি আমরা অন্য কোন বিকল্পের কথাও চিন্তা করবো না? অবশ্যই করবো। আমাদের দেশে প্রতিদিন বিপুল পরিমান পশুচর্বি উৎপাদন হয়, যা বেশির ভাগ সময় উচ্ছিষ্ট হিসেবেই ফেলে দেয়া হচ্ছে।

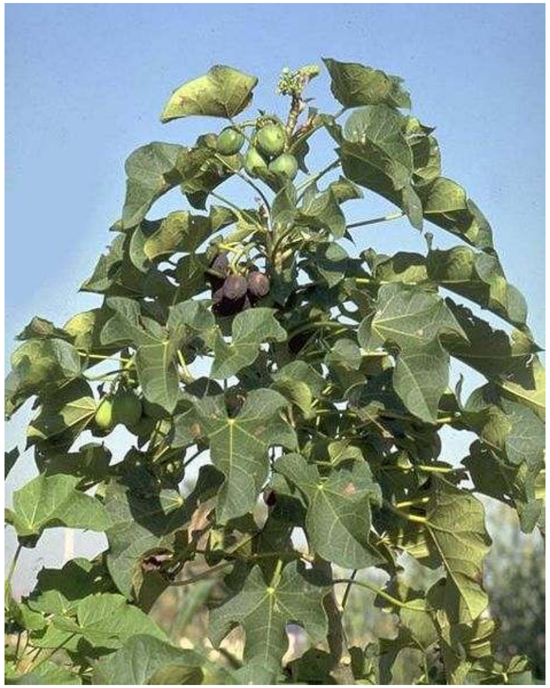

জাত্রুপা হতে পারে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে

জৈব জ্বালানী তৈরির সম্ভাবনাময় উৎস

আমাদের দেশে মহাসড়ক কিংবা রাস্তার দু’পাশে বিপুল পরিমান ফাঁকা জায়গা আছে। সেই জায়গাতে জাত্রুপা (স্থানীয়ভাবে "জামালগোটা" হিসেবে পরিচিত) চাষ করলে কি খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যাবে? নিশ্চয়ই না। জাত্রুপার জন্য আলাদা সার কিংবা কোন ধরনের পরিচর্যারও প্রয়োজন হয় না। উল্লেখ্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে গবেষণা চলছে এবং অনেকে ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছেন বলেও শোনা যায়। হয়তো গবেষনার সুযোগ পর্যাপ্ত না হওয়ায় তা চূড়ান্ত সাফল্যের মুখ দেখছে না।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যহত না করেও জৈব জ্বালানী উৎপাদন করা সম্ভব। আর তা দিয়ে কিছুটা হলেও জ্বালানী সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। আমাদের দেশে 'জামালগোটা' জৈব জ্বালানী উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু অন্য দেশের প্রেক্ষাপটে তা নাও হতে পারে। প্রতিটি দেশকেই খুঁজে নিতে হবে তাদের জন্য কোন উৎসটি সুবিধাজনক হবে। অর্থাৎ, খুঁজে বের করতে হবে এমন একটি উৎস যা আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি না এবং যা থেকে জৈব জ্বালানী তৈরি করা সম্ভব। আর সেই খুঁজে বের করার কাজটির জন্য প্রয়োজন আছে গবেষণার। যেমনঃ কানাডায় সয়াবিন তেলের বিকল্প হিসবে ‘কেনোলা’ (Canola) ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে, কানাডায় প্রতি বছর যে পরিমান কেনলা উৎপন্ন হয় তাতে নিজেদের ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণ বিপুল পরিমান রপ্তানি করার পরেও বায়োডিজেল তৈরি করতে পারবে। সুতরাং, আগেভাগেই কিছু বলা সম্ভব না। তবে কোন দেশ যদি সস্তা এবং অপ্রয়োজনীয় উৎস ফেলে গম বা ভুট্টার মতো খাদ্যশস্য থেকে জ্বালানি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় তাকে বোকামি বা আত্মঘাতী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

জৈব জ্বালানীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন আগ্রাসী নীতির কাছে মাথা নত নয় বরং নিজেদের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে। অর্থের লোভে কৃষকদের খাদ্যশস্যের বদলে শক্তিশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত বা বাধ্য করা বন্ধ করতে হবে। কারন, খাদ্যশস্যের বদলে শক্তিশস্য (Energy Crop) উৎপাদন কিংবা খাদ্যশস্য থেকে

জ্বালানী উৎপাদন কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে কোন দেশ যদি মনে করে সে ফেলে দেয়া পশুর চর্বি থেকে কিংবা ডোবায় জন্মানো শ্যাওলা থেকে জৈব জ্বালানী তৈরি করতে পারে এবং তা দিয়ে জ্বালানী সমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভব তাহলে সমস্যা কোথায়? সকল প্রযুক্তিরই ভালোমন্দ দিক আছে। তাই আমরা চাইলেই খাদ্য সংকট সৃষ্টি না করেও জৈব জ্বালানী প্রযুক্তিটিকে ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের শক্তি চাহিদা পূরণ করতে পারি।

[তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া, ন্যাশনাল বায়োডিজেল বোর্ড, বিবিসি, গার্ডিয়ান সহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে সংগৃহীত]
লেখক বিপ্র রঞ্জন ধর "আমাদের প্রযুক্তি" ফোরামের একজন প্রতিষ্ঠাতা ।
বর্তমানে স্নাতোকোত্তর গবেষণায় জড়িত আছেন

কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষণ - আগামী দিনের সৌরকোষ!

- সোহাগ

পরিবেশে গ্রীনহাউস গ্যাসের কোন নিগর্মন ছাড়াই ফটোভোল্টিক সেল বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারলেও এর উৎপাদন খরচ গ্যাস-কয়লার চেয়ে উল্লেখযোগ্য রকম বেশী। আলোকশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞানীগণ সৌরকোষ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করছেন।

স্কুলে আমরা শিখেছি, গাছের পাতা সূর্য থেকে আলোকশক্তি শোষণ করে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন করে। এই পাতা গাছের জন্য সৌরকোষের ন্যায় কাজ করে। এখান থেকেই আসে জৈব সৌরকোষ (Bio photovoltaic cell) এর ধারণা এবং সেইসাথে চলতে থাকে গবেষণা। এই গবেষণার হাত ধরেই আসে পেট্রলিয়াম ভিত্তিক প্লাস্টিক সৌরকোষ। এটা প্রচলিত সিলিকন ফটোভোল্টিক সেলের থেকে সাশ্রয়ী হলেও এর দক্ষতা গাছের পাতার ধারের কাছেও না! কারণ, পাতা তার উপর আপতিত আলোক রশ্মির প্রায় পুরোটাই শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

মৌলিক গবেষণা থেকেই সবসময় উৎসাহ আসে। তাই অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীগণ সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করছেন যে পদ্ধতিতে আলোকশক্তির রাসায়নিকশক্তিতে পরিণত হবার দক্ষতা প্রায় শতভাগ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেগরি এস. এনজেল এর নেতৃত্বে একটি দল ৭৭ কেলভিন (-১৯৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় একটি গ্রীন সালফার ব্যাকটেরিয়ামকে শীতল করেন। তারপর ব্যাকটেরিয়াটির আলোক সংবেদী প্রত্যঙ্গ দিয়ে শক্তির প্রবাহ লক্ষ্য করার জন্য এর উপর অতিক্ষুদ্র পালস্ এর লেজার রশ্মি প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ ব্যাখ্যা করত সক্ষম হলেন- গাছ কিভাবে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য সৌরশক্তিকে আনবিক বিক্রিয়া কেন্দ্রে (Molecular Reaction Centers) প্রেরণ করে। সালোকসংশ্লেষণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগে ধারণা ছিল- ক্রোমোফোর নামক একপ্রকার আলোক শোষণকারী অণু সূর্য থেকে শক্তি শোষণ করে তাপের পরিবহণ পদ্ধতি' র ন্যায় এক অণু থেকে পার্শ্ববর্তী আরেক অণুতে শক্তি প্রেরণ করে। এভাবে সম্ভাব্য সকল পথের মাধ্যমে শক্তি বিক্রিয়া কেন্দ্রে পৌঁছায়।

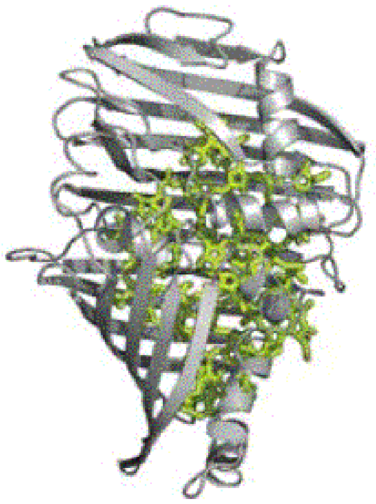

ব্যাকটেরিয়ার ফটোসিনথেসিস সিস্টেম, যেটা সৌর প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

কিন্তু এই নতুন গবেষণার ফলাফল আগের ধারণাকে নাকচ করে দিল। কোন প্রক্রিয়ায় শক্তি তরঙ্গাকারে তার গন্তব্যে প্রায় তাৎক্ষণিক ভাবেই প্রবাহিত হয় এবং কোয়ান্টাম ক্রিয়া সবচেয়ে দক্ষ পথে শক্তির প্রবাহ নিশ্চিত করে। হয়তো এই নতুন তথ্যের উপর ভিত্তি করে কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হতে পারে যার সাহায্যে হয়তো আরো দক্ষ ফটোভোল্টিক কোষ তৈরী হবে।

আরেকদল বিজ্ঞানী বাড়ি-ঘর গরম বা ঠান্ডা করার জন্য উন্নততর পদ্ধতিতে সূর্যালোক ব্যবহারের পরিকল্পনা করছেন। Rensselaer Polytechnic Institute এর গবেষক স্টিভেন ভ্যান ডেসেল ও তার সহকর্মীরা Active Building Envelope (ABE) নামে একটি প্রক্রিয়ার প্রোটোটাইপ তৈরী করেছেন যা সোলার প্যানেলের সংযোজন (Coupling) যেটা থার্মোইলেক্ট্রিক হিট পাম্পে কাজ করবে। সৌরকোষে উৎপন্ন বিদ্যুৎ হিট পাম্পে যাবে। এটি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকের উপর নির্ভর করে ভবনের এর অভ্যন্তরকে গরম বা ঠান্ডা করবে। গবেষণা দলটি এখন স্থুল উপাদানের পরিবর্তে পাতলা ফিল্ম ফটোভোল্টিক কোষ এবং থার্মোইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে স্বচ্ছ ABE সিস্টেম তৈরীর সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। এই স্বচ্ছ ফিল্ম বাসা-বাড়ির জানালার কাঁচ, গাড়ির উইন্ডশিল্ড কিংবা সানরুফ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। ফলে জানালার কাঁচ শুধু ধুলা-বালি বা ঝড়-বাতাস থেকে রক্ষা করবে না; বরং তা শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করবে!

[তথ্য প্রযুক্তির কথাবার্তা]

মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ – আমাদের করণীয় কী হবে?

মুনির হাসান

ওরা আমাদের জমির জন্য এসেছিল, এসেছিল জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয় বা হতে পারে তার সম্পদ দখলে নিতে আর আমাদের মুক্ত হাওয়া আর বিশুদ্ধ পানির জন্য। ওরা আমাদের এই সকল সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের স্বাধীনতাকেও। আর আমাদের সূর্যসন্তানদের জীবন দিতে হয়েছে হয় যুদ্ধের ময়দানে অথবা গুপ্তঘাতকের হাতে। আর সবকিছু শেষে ওরা আবার ফিরে এসেছে আমাদের - শেষ অবলম্বনটুকু ছিনিয়ে নিতে। এখন ওরা আমাদের গর্ব, আমাদের ইতিহাস নতুন করে, তাদের মতো করে লিখতে চায়। যেন ওরা দাবী করতে পারে যে, এইগুলো তাদেরই। এভাবে মিথ্যা ও লুন্ঠন চলে আসছে, থামছে না।

- আদিবাসীদের একটি গান থেকে।

বিশ্বে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে প্রতিনিয়ত। আরো বাড়বে বলে শুনেছি। জ্বালানি তেলের দাম এমনটি বেড়েছিল ১৯৭৩ সালে। সেবার আরবদের হাতে নাকানি খেয়ে আমেরিকার সিনেট একটা কমিটি গঠন করে যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমেরিকার সংকট হতে পারে এমন বিষয় চিহ্নিত করার। তারা বললো - "তথ্য এবং যোগাযোগ" হবে নতুন ক্ষেত্র। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফোর্ড সাহেব একটা জাতীয় টাস্ক ফোর্সও গঠন করে ফেললেন। টাস্ক ফোর্স বললো নতুন সম্পত্তি বানাতে হবে। সুপারিশ দেওয়া হলো স্বত্ত্ব - বলতে লোকে জমি বা দালান বোঝে, সেখান থেকে এটিকে সম্প্রসারিত করতে হবে তথ্যপ্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে, যাতে টিকে থাকে আমেরিকার একাধিপত্য। কিন্তু মাঠে তখনো সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল। কাজেই মার্কিনীদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপর এলেন গর্বাচেভ। আর বিশ্ব হলো এক মেরুর।

শুরু হলো বিশ্বকে বাণিজ্যকরণের নানা উদ্যোগ। উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনায় হলো *জিএটিটি* (GATT) । গঠিত হলো *বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা* (WTO) । হলো *দি এগ্রিমেন্টস অন ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টিজ* (ট্রিপসবিশ্ববাণিজ্য ।(সংস্থার ওপর দায়িত্ব পড়লো সারা বিশ্বে আমেরিকার তথা উত্তরের দেশগুলোর হয়ে মাস্তানী করা, দক্ষিণের দেশগুলো কিছু বুঝে ওঠার আগে তাদের জাতীয় নীতিমালাগুলোকে 'যথাযথ', 'বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ' করার। এর আগে পর্যন্ত কপিরাইটের ব্যাপারগুলো ছিল নেহায়েৎ নিজ নিজ দেশের। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বললো 'এসো আমরা এগুলোকে একই সুর আর লয়ে সুরারোপিত করে দেই'।

দক্ষিণের দেশগুলোতে নানাভাবে ওয়াইপো আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তাদের খেলা শুরু করে দিল। দেশে দেশে হয় কপিরাইট আইন সংশোধন করা হলো অথবা নতুন করে প্রনয়ণ করা হল। তথ্যপ্রযুক্তির সকল অংশ থেকে শুরু করে তথ্যের প্রবেশাধিকারকেও করা হলো এই আইনের অধীন। কোন কোন দেশে পুলিশের সেপাইদেরকে এই আইনের রক্ষক করা হল। এইগুলো করার জন্য পশ্চিমারা ব্যবহার করলো তাদের চিরন্তন অস্ত্র - মেরুন রঙ্গের জ্যাকেট, বিদেশ ভ্রমণ কিংবা অন্যান্য সুবিধা। বাংলাদেশেও কপিরাইট আইন সংশোধন হয়ে গেল, সবার অজান্তে একবার ২০০০ সালে আর একবার ২০০৫ সালে। মাত্র কয়েকমাস আগে আমাদের ট্রেডমার্ক আইনও ওদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সংশোধিত হয়ে গেছে!

কপিরাইট ও সৃজনশীলতা

কপিরাইটের মূল কথা হলো সরাসরি আর্থিক - প্রনোদনা না থাকলে উদ্ভাবকরা কোন কিছু উদ্ভাবন করবেন না - শিল্পী আর গায়কেরা ঘুমিয়ে থাকবেন, লেখকরা তাদের কলম নামিয়ে রাখবেন, এবং সব ধরণের সৃজনশীলতা বন্ধ হয়ে যাবে।

কপিরাইট আসলে এভাবে সকল সৃষ্টকর্মের জন্য আর্থিক প্রনোদনাকে সংশ্লিষ্ট করেছে। এখন কেহ যদি বলে লালনের গানের অনুপ্রেরণা আসলে টাকা তাহলে তাকে কী বলা যাবে? রবীন্দ্রণাথ বা শেক্সপিয়রের বেলায়!

আবার সারা বিশ্বের কপিরাইট আইনের মূল যে, বার্ণ কনভেনশন, সেখানে বলা হয়েছে মৃত্যুর পর ৫০ বছর পর্যন্ত কপিরাইট বহাল থাকবে। বটে, যে লোকটা বেঁচে নেই, আমার অর্থ তার সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভালো যুক্তি!

কপিরাইট ওয়ালাদের ভাব দেখে মনে হয় মহৎ উদ্দেশ্য। আসলে এই আবরণে শিল্পী ও লেখকের সঙ্গে রেকর্ড কোম্পানী বা প্রকাশককে গুলিয়ে ফেলা হয় যাতে লোকে ব্যাপারটাকে মহৎ ভাবে। কখনো দেখেছেন কবির কবিতার কপিরাইট নিয়ে কেও উচ্চবাক্য করছে। আমাদের দেশেও মোবাইলের রিংটোনের আগে কেহ এ বিষয়ে কিছু বলেছে? আসলে এ হলো কোম্পানীগুলোর টাকা কামায়ের একটা ফিকির।

১৯৯৮ সালে আমেরিকা তাদের মেধাস্বত্ত্ব আইনে কপিরাইটের মেয়াদ ৫০ বছরের জায়গায় বাড়িয়ে ৭০ বছর করে। কারণ ২০০৩ সালে মিকি মাউস পাবলিক ডোমেনে চলে আসতো। পাবলিক ডোমেন মানে হলো এখনকার বিষয়বস্তু সারা পৃথিবীর মানুষের সম্পত্তি। যেমন রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়রের সৃষ্টকর্ম। মিকি মাউসো সেভাবে সবার অধিকারে চলে আসতো। কিন্তু নতুন আইনে এর মেয়াদ আরো ২০ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয় যার ফল পাবে কেবল ওয়ার্ল্ড ডিজনী কর্পোরেশন, মিকি মাউসের প্রণেতা একটাকাও পাবে না। কতো সহজেই না এটি হয়েছে। কারণ এর আগের বছরে ওরা বিভিন্ন ফোরামে মাত্র ৬ মিলিয়ন ডলার চাদা দিয়েছিল।

কপিরাইটের একটা বড়ো দুর্বলতা হলো এটি একটি কর্মের শেষজনকে চিহ্নিত করে মাত্র। আমাদের জাতীয় সংগীত, আমার সোনার বাংলা। এর সুর করার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়ার বাউল গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাবো তারে’ গানের সুর দ্বারা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এখন আমার সোনার বাংলার সুরের কপিরাইট কী কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হওয়া উচিৎ?

যেকোন সৃজনশীল কর্মের প্রেরণা হলো সৃষ্টির আনন্দ, সৃষ্টির নেশা। সৃষ্টির আনন্দ কী টাকা দিয়ে মাপা যায়?

মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত লুন্ঠন

আমরা আবার বিশ্ব কপিরাইট ইস্যুতে যাই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় গরীব দেশগুলোর সম্মিলিত স্বরে মার্কিনীরা তাদের সুর পাল্টালো। ব্রিটিশদের কাছ থেকে শেখা ডিভাইড এন্ড রুল নিয়ম নিয়ে তারা হাজির হলো এই মাঠে। দেরী হচ্ছে এই ধুয়া তুলে শুরু হলো দ্বি বা বহুপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। ২০১৩ সাল পর্যন্ত সফটওয়্যার ও ২০১৬ সাল পর্যন্ত ফার্মাসিউটিক্যাল পন্যের কপিরাইটের ব্যাপারে স্বল্প উন্নত দেশগুলোকে কিছুটা ছাড় দেওয়া আছে। এখন আমেরিকা সহ উত্তরের রাজারা দক্ষিণের প্রজাদের সঙ্গে দ্বিবা বহুপক্ষীয় - 'মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি' করছে। এখানে কপিরাইটের ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি করা হচ্ছে। কারণটা কী?

সহজ। কপিরাইট বাণিজ্যে মার্কিনীদের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। ১৯৯৯ সালে কপিরাইট গুণে অন্যান্য দেশ থেকে আমেরিকার আয় করেছে ৩৬ ৫. বিলিয়ন ডলার কিন্তু অন্য দেশগুলোকে দিয়েছে মাত্র ১৩৩. বিলিয়ন ডলার। ১৯৯১ সালে সফটওয়্যারের লাইসেন্স ফী বাবদ ওদের আয় ছিল ১৯৬৫. বিলিয়ন ডলার। ২০01 সালে তা বেড়ে হয়েছ ৬0বিলিয়ন ডলার। ৭৪. কাজেই এই সোনার হাসকে তো তারা বড়ো করতে চাইবেই !

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির একটা অংশ হলো ওদের ডিজিটাল মিডিয়া কপিরাইট এক্ট ডিএমসিএ। এতে কপিরাইট - প্রটেকশনের নামে নানান ধরণের কারিগরী উৎপাত যোগ করাকে জায়েজ করা হয়েছে। এর ফলে তথ্যের প্রবেশাধিকার অনেকখানি সংকুচিত হয়ে যায়।

শেষের আগে

ধনীর কাছ থেকে গরীবের চুরি নিশ্চয় পাপ, কিন্তু ধনীরা যখন গরীবের থেকে চুরি করে তখন কী সেটা মহাপাপ নয়? আমাদের মতো গরীব দেশগুলোর ধণীদের তথাকথিত মেধাসম্পদ নেওয়া যদি চুরির মতো অপরাধ হয়, তাহলে আমেরিকার মতো ধনী দেশগুলো যে আমাদের দেশের মেধাবীদের চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সেটা কি ঘৃন্য অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না?

আমরা যখন 'চুরি' করি, তখন কেবল তার একটা কপি 'চুরি' করি, আসলটা সেখানে রেখে আসি। কিন্তু ওরা যখন **চুরি** করে তখন তারা আমাদের জন্য কিছুই রেখে যায় না!

মুনির হাসান সাধারণ : সম্পাদক, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক।

ইন্টারনেট প্রজন্ম

--- নাশিদ শাহরিয়ার

আমাদের দেশের বর্তমান শহুরে প্রজন্ম অনেকটাই ইন্টারনেট নির্ভর- তাই একে ইন্টারনেট প্রজন্ম বললে খুব একটা অত্যুক্তি করা হবে না। আজ থেকে দশ বছর আগেও এদেশে কম্পিউটার এতটা সহজলভ্য ছিল না; ইন্টারনেট, ইমেইল এর ব্যবহার তো অনেক দূরের ব্যপার। নানা প্রতিবন্ধকতা আর অনেক সম্ভাবনাকে হেলায় হারানো সত্বেও আমরা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যতটা এগিয়েছি তাতে মূল ভূমিকা রেখেছে এই প্রজন্ম। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা স্বপ্ন দেখতে পারছি স্বাধীনতার রৌপ্যজয়ন্তীতে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশের। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে এই ইন্টারনেট প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে অনেক, সেইসাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের সর্বত্র নতুন প্রজন্মের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে ইন্টারনেট সুবিধা।

আমাদের জাতীয় চেতনার বিকাশে বেশ একটা সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে ইন্টারনেট ও প্রযুক্তি।এর একটি উদাহরণ হল, প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে ইন্টারনেটে ভোটের মাধ্যমে আমাদের দেশের কক্সবাজার আর সুন্দরবনের শীর্ষস্থানে থাকাটা। শুধুমাত্র দেশের গৌরবের জন্য যে যার অবস্থান থেকে প্রচারণা চালাচ্ছে আর সবাইকে ভোট দিতে উৎসাহিত করছে। তার ফলেই প্রযুক্তি আর ইন্টারনেট ব্যবহারে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও আমাদের প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলো সেসব দেশের বিভিন্ন স্থানের চেয়ে ভোটে এগিয়ে রয়েছে। ইন্টারনেটের কল্যানেই আমাদের কৃতি প্রবাসীরা দূরে থেকেও দেশের যেকোন কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারছে, সেসব দেশে আমাদের ইতিহাস-সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস নিচ্ছে। এই প্রজন্মের তরুণরা উইকিপিডিয়ার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে, বাংলাদেশকে তুলে ধরছে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে। এসবের ফলশ্রুতিতে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে নিজ পরিচয়ে পরিচিত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ; আগের মত ভিনদেশীদেরকে নিজ পরিচয় তুলে ধরতে অসুবিধায় পড়তে হয় না এখন, বলতে হয় না দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পাশে ছোট্ট একটা দেশের অধিবাসী আমরা।

সবমিলিয়ে এই প্রজন্মের বাসিন্দাদের জীবন-যাপনে বেশ বড় ভূমিকা রাখছে ইন্টারনেট; তাদের দিনের একটা বড় সময় ব্যয় করে কম্পিউটার বা মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারে। ইন্টারনেটই তাই হয়ে উঠেছে তাদের জ্ঞানার্জনের অন্যতম উৎস, যোগাযোগের মাধ্যম, বিনোদনের অনুষংগ, এমনকি মতামত প্রকাশ ও প্রতিবাদের ক্ষেত্র। ব্লগগুলো হয়ে উঠছে সাহিত্যচর্চার একেকটি লিটল ম্যাগাজিন, চ্যাটরুম আর মেসেঞ্জারগুলো হয়ে উঠছে আড্ডাস্থল, চিঠির স্থান দখল করে নিয়েছে ইমেইল আর এস. এম. এস. । যেকোন ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেই সংবাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে

দেশ ও দেশের বাইরে সকলের কাছে, ইউটিউবের কল্যানে ঘটনার সচিত্র সংবাদও পৌছে যাচ্ছে দ্রুতই। দৈনিক পত্রিকা আর সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইটগুলোতে প্রাত্যহিক হিটের বিশাল সংখ্যা বুঝিয়ে দিচ্ছে সংবাদ প্রচারের এই মাধ্যমটি ইতোমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এই প্রজন্মের কাছে। জাতীয় পর্যায়ের যেকোন ঘটনা নিয়ে ব্লগগুলোতে আলোচনা, বিশ্লেষণ, আর নানামুখী প্রতিবাদের মাত্রা দেখে বোঝা যায় তারা দেশের বিষয়ে অনেকটাই সচেতন ও ভাবনা চিন্তা করে। অনেকক্ষেত্রে যেকোন অন্যায় কিংবা জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রাথমিক জনমত আর প্রতিবাদের শুরুটা গড়ে উঠছে ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করেই। ইন্টারনেটভিত্তিক প্রতিবাদের মাত্রা কখনো কখনো এতটাই তীব্র হয়েছিল যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্লগ বা ওয়েবসাইটগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণের অপচেষ্টা চালানোর নজির দেখা গিয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

আজকের তরুণ প্রজন্মের ভাবনা আর কর্মকান্ডকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে ইন্টারনেট আর প্রযুক্তি তার একটা চিত্র দেখা গিয়েছে গত সাধারণ নির্বাচনের আগের দিনগূলোতে; যে নির্বাচনে এক তৃতিয়াংশের চেয়ে বেশি তরুণ ভোটার হয়ে উঠেছিল অন্যতম নিয়ামক। যুদ্ধপরাধীদের প্রতিহত করার প্রচারণায়, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে কিংবা না ভোটের স্বপক্ষে প্রচারণায় যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল ইন্টারনেট গ্রুপ, ফেসবুকের মত সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট কিংবা ই-মেইল আর এসএমএসের মাধ্যমে। তার ইতিবাচক ফলও দেখা গিয়েছে নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যদিয়ে। একাত্তরে রাজাকারদের গণবিরোধী নির্মম ভূমিকাকে ইন্টারনেটের মাধ্যামে পুরোপুরি তুলে ধরা গেছেই বলে তা এতটা দাগ কাটতে পেরেছিল তরুণদের মননে। আমি আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুকে দেখেছি, শুধুমাত্র একাত্তরের ঘৃণ্য ভূমিকার কথা জেনে পারিবারিকভাবে কোন বিশেষ জোটের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও যুদ্ধপরাধীদের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারনে ঐ জোটকে পুরোপুরি প্রত্যাখান করেছে। এই ঘটনা প্রমান করে আজকের প্রজন্ম আর আগের মত অন্ধবিশ্বাসের জোরে চালিত হয়না, তারা জে.নে, বুঝে বিবেক দিয়ে সিধান্ত নেয়। তারা যে শুধু রাজাকারদের প্রত্যাখ্যাণ করেই থেমে থাকবে না তার প্রমাণ দেয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে শুরু করা অনলাইন পিটিশনগুলো এবং তাতে তরুণদের স্বতস্ফূর্ত, বিশাল সমর্থন। এর পাশাপাশি ব্লগ এমনকি ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটির সরব উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। তাই বলা যায় তরুন প্রজন্ম আর প্রযুক্তির হাত ধরেই যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবিটি আবার গণদাবিতে পরিণত হয়েছে, তাদের সক্রিয় ভূমিকাতে অচিরেই তা বাস্তবায়িত হবে, নাহলে হয়ত তারা আরেকটি যুদ্ধের সূচনা করবে যেই যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার হবে প্রযুক্তি।

তরুনপ্রজন্মের এই অতিরিক্ত ইন্টারনেট নির্ভরতা যে সবসময় আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষে সহায়তা করে তা কিন্তু নয়, অনেক নেতিবাচক আর প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারনার কাজেও একে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন আগে সামহোয়ারইনব্লগে রাজাকার- আলবদরদের স্বপক্ষে ব্যাপক ব্লগের উপস্থিতি কিংবা অতি সাম্প্রতিককালে বিডিআর সদরদপ্তরে সংঘঠিত মর্মান্তিক ঘটনার দুর্যোগময় সময়ে নানা ধরনের গুজব আর উস্কানিমূলক বক্তব্য ছড়ানোর কাজে ইন্টারনেটের ব্যবহারের কথা। আরেকটি ব্যাপার; এই প্রজন্ম প্রযুক্তির নিত্য- নতুন অনুষংগ ব্যবহারে যতটা উদগ্রীব, প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশ, দেশের ইতিহাস তুলে ধরতে, জাতীয় চেতনায় প্রযুক্তির অবদান রাখতে, কিংবা এর জন্য পরিশ্রম করতে ততটাই উদাসীন। ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, অনেকে হয়ত অনলাইন

পিটিশনে সমর্থন দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করে, এই দাবিকে সোচ্চার করে তুলতে সময় ও স্বেচ্ছাশ্রম দিতে খুব একটা উৎসাহী থাকেনা। তারচেয়ে হয়ত চ্যাট আর অনুৎপাদনশীল কাজে বেশি সময় নষ্ট করতে ব্যস্ত থাকে। ইন্টারনেটের প্রভাবে গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হওয়া এই বিশ্বে আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির উপর আঘাত আসছে। নতুন আর পরিবর্তনের আবাহনে তরুণ প্রজন্ম পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে খুব সহজেই, যা কিছুটা হলেও আমাদের মূলে আঘাত হানছে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই জোরালো অবদান আমাদের এতদিনের ব্যর্থতা আর বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ববোধের বিষয়টিকে কিন্তু সামনে নিয়ে এসেছে। জাতি হিসেবে আমাদের তথা বাংলাদেশের অর্জন বলতে যে দুটি বিষয়ের কথা আমরা বলি তা হচ্ছে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন আর '৭১ গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের কথা। আমাদের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজরিত একুশে ফেব্রয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কিন্তু আমরা কি পেরেছি বাঙ্গালির ভাষার জন্য রক্তদানের বিরল ও অসামান্য ইতিহাসকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দিতে কোন উদ্যোগ নিতে, যেমনিভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দিবসে তার পটভূমিকে স্মরণ করে সেরকম ভাবে এই বিরল ঘটনাকে তুলে ধরতে, না পারিনি। সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহারের অংশ হিসাবে কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের বাংলা প্রচলনের কাজটিও এতদিনে শেষ করা সম্ভব হয়নি। যদিও এর জন্য অল্পকিছু নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির নানামুখী উদ্যোগ আর প্রচেষ্টা চলছে বেশ আগে থেকেই। আর সেইসাথে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস নিতে হবে, কেননা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছে দিতে এরচেয়ে কার্যকর উপায় আর নেই।

দীর্ঘ ৩৮ বছর হয়ে পেরিয়ে গেলেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাংগ ইতিহাস সকলের কাছে পৌছানোর প্রয়াস নেয়া হয়নি, এমনকি জানতে দেয়া হয়নি পাক-হানাদার আর তাদের দোসর রাজাকারদের বর্বর অত্যাচারের কথা। শুধু তাই নয়, এতদিন পেরিয়ে গেলেও এতটুকু উদ্যোগ নেয়া হয়নি যাতে গত শতাব্দীর এতবড় ঘটনার কথা সারাবিশ্বের নতুন প্রজন্ম জানার কিছুটা সুযোগ পায়।

গত ডিসেম্বর মাসে ফেইসবুকে একটা প্রচারনা শুরু হয়েছিল যাতে সবাই অন্তত সেই মাসে প্রোফাইল ছবি হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করে, আর এই ডাকে সাড়া দিয়েছিল প্রায় সব বাংলাদেশি ব্যবহারকারী। সে এক অন্যরকম অনুভূতি- বিজয়ের মাসে ফেইসবুক জুড়ে আমাদের গৌরবের লাল-সবুজের আধিক্য নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছে সবাইকে। আমরা যদি এই অনুপ্রেরণাকে, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে প্রকৃতঅর্থেই হৃদয়ে লালন করে যেতে পারি সবসময়, একে কাজে লাগিয়ে কিছুটা হলেও দেশের জন্য অবদান রাখতে পারি সেটাই ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে নিকট ভবিষ্যতে। সেইসাথে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের এই উদ্যম আর স্পৃহাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা দিতে হবে আমাদের অগ্রজদের, সব বিভেদ ভুলে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। তবেই আমাদের জাতীয় চেতনার বিকাশে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে এই ইন্টারনেট প্রজন্ম।

ওয়্যার হাউস এপ

সৌমেন দাস

একটি বড় অথবা মাঝারি সফটওয়্যার প্রজেক্টে একের অধিক ডেভেলপার কোডিংয়ের কাজে নিয়োজিত থাকেন। যখন একই সাথে সবাই কোডিং করতে থাকেন তখন কোনো কোড ব্যবস্থাপনা/ম্যানেজমেন্ট না থাকলে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। 'সাবভার্সন' ঠিক এই কোড ম্যনেজমেন্টের কাজটিই করে থাকে। কিছু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল যেমন; Sourceforge, Target Process ইত্যাদিতে সাবভার্সন ব্যবস্থাটি দিয়ে দেওয়া থাকে। কিন্তু যদি যদি শুধুমাত্র সাবভার্সন ব্যবস্থাটি নিয়েই কোনো আপ্লিকেশন চান তবে ওয়্যারহাউসঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনটি হতে পারে একটি ভালো সমাধান। কিছুদিন আগেই এই আপ্লিকেশনটি ওপেন সোর্সড হয়েছে।

৩-৪ বছর আগে আমি যখন প্রথম সাবভার্সন ব্যবহার করি কোড ম্যনেজমেন্ট এর জন্য, আমি প্রায় বিভ্রান্ত ছিলাম সাবভার্সন প্রসেসটা দেখে। কমান্ড লাইনে অনেকগুলো সাবভার্সন কমান্ড লিখে (আমি * nix platform ব্যবহার করি, উইন্ডোজ ইউজারদের জন্য TortoiseSVN সফটওয়্যারটি কাজ সহজ করে দেয়) কাজ করতে হতো বিষয়টাকে ম্যনেজ করবার জন্য। আমার মনেহয় যে কোন নতুন ডেভেলপারের জন্য শুরুতে সাবভার্সন কনসেপ্টটা বুঝতে একটু কষ্ট হবে যদি না পুরো প্রসেসটা সম্পর্ক একটা ভালো ধারণা না থাকে। অন্য সদস্যদের কোডের কোনো ধারণা না রেখেই আপনি যদি সাবভার্সন দিয়ে কমিট / আপডেট / ডিলিট করেন আপনার কোডে, তবে অবশ্যই সেটা হবে একটি ভুল পদক্ষেপ। আধুনিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস এই বিষয়টিকে অনুমোদন করে না। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট একটি টিম ওয়ার্ক। আপনি Agile Process অনুসরণ করলে, অবশ্যই আপনাকে কোডের সব বিষয়/ প্রসেস সম্পর্কে জানতে হবে। এটা ডেভেলপমেন্ট দলের সদস্য এবং দলের প্রধান উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। এই সাবভার্সন- এর কাজগুলো আরও সহজভাবে করবার জন্য, ওয়্যারহাউসঅ্যাপ হল একটি ওয়েব ভিত্তিক সলুশ্যন।

বর্তমান সময়ে Rails framework দিয়ে অনেক ওয়েব ২.০ অ্যাপ্লিকেশনস হচ্ছে। এর মধ্যে ওয়্যারহাউসঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনটি অন্যতম, যার র্নিমাতা প্রতিষ্ঠান ActiveReload কোম্পানী। তাদের আরও কিছু জনপ্রিয় ও বিখ্যাত প্রজেক্ট হলো Lighthouse, Mephisto ইত্যাদি। রিক ওলসেন এবং জাস্টিন পালমার যৌথভাবে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাঝে, রিক Ruby on Rails এবং পালমার Prototype Javascript Library দলের সদস্য।

এবার এই অ্যাপ্লিকেশনটার প্রসংঙ্গে আসি। এটি একটি সাবভার্সন ব্রাউজার, যার কিছু উল্লেখযোগ্য ফিচার হচ্ছেঃ

১. মাল্টি রিপোজিটরী সার্পোট করে।

২. প্রতিটি রিপোজিটরী আলাদাভাবে ইউজার ম্যানেজ করা যায়।

৩. ওপেন আইডি।

৪. প্রতিটি রিপোজিটরীর জন্য আলাদা সাবডোমেইন। আপনার আলাদা সাবডোমেইন সার্পোটটি যদি প্রয়োজন না হয় তবে এই ফিচারটি বন্ধ করা যায়।

৫. রিপোজিটরী সিঙ্ক (Sync) ।

৬. ডিরেক্টরী লেভেল এক্সেস।

৭. রিপোজিটরী বুকর্মাক, লগ করার ব্যবস্থা।

৮. ওয়েব ২ ইন্টারফেসটি খুবই পরিচ্ছন্ন এবং ইউজার ফ্রেন্ডলী একটি ইন্টারফেস।

কিছু অসুবিধাঃ

ওয়্যারহাউজঅ্যাপ- এর একটিই সমস্যা, এই অ্যাপলিকেশনটি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাবভার্সন রিপোজিটরী তৈরী করা যায় না। প্রথমে আলাদাভাবে রিপোজিটরীটি তৈরী করে তারপর ওয়্যারহাউজঅ্যাপ- এর সাথে সংযুক্ত করতে হয়। - অবশ্য ওয়্যারহাউজঅ্যাপ ডেভেলপাররা পরবর্তী ভার্সনে এই সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করছেন।

ওয়্যারহাউজঅ্যাপ ইন্সটল প্রসেসঃ

ওয়্যারহাউজঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনটি ইন্সটলের পূর্বে অবশ্যই পিসিতে Rails ভার্সন 2.x.x সিরিজ এবং Rails Subversion Bindings এই সফটওয়্যার দুইটি ইন্সটল থাকতে হবে। এছাড়া Apache ওয়েব সার্ভারটি mod_dav এবং mod_dav_svn মডিউলসহ কনফিগার করার প্রয়োজন পড়বে। নিম্নের ডাউনলোড লিংক থেকে ওয়্যারহাউজঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনটি পাওয়া যাবে এবং ওয়েব পেইজটির নিচের দিকে ইন্সটল নির্দেশাবলীও দেওয়া আছে:
http://github.com/entp/warehouse/tree/master

উবুন্টু ইউজাররা এই লিংক হতে ইন্সটল প্রসেস সম্পর্কিত তথ্য পেতে পারেন:
http://blog.andremedeiros.info/2008/10/warehouse-installation-tutorial/

কেন ওয়্যারহাউজঅ্যাপঃ

প্রথমেই যে বিষয়টি বলা যায়, এই অ্যাপ্লিকেশনটি শুধুমাত্র সাবভার্সন বিষয়টিকে নিয়েই কাজ করে। এর অসাধারণ ইউজার ইন্টারফেসটিতে কাজ করতে আপনার ভালই লাগবে, কোন সন্দেহ নেই। সহজেই কোডের পরির্বতনগুলো আপনি বুঝতে পারবেন। সাধারণ সদস্য প্যানেলের “অ্যাকটিভিটি” ট্যাবটিতে দলের অন্য সব সদস্যদের কোডিং কার্যক্রম (কমিট/ আপডেট/ ডিলিট ইত্যাদি) লিস্ট আকারে পাওয়া যাবে। কোড এবং প্রজেক্টের অগ্রগতি এই লিস্ট দেখেই জানতে পারবেন। দলের কোন সদস্য কোন ফাইলটিতে কাজ করেছে অথবা ফাইলের কোন অংশে কাজ করছে, তার সবকিছুই এই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে জানা যাবে।আরেকটি ভালো আইডিয়া

হলো, রিপোজিটরী বুকর্মাক করা। বড় অথবা মাঝারি প্রজেক্টের কোড ম্যানেজমেন্টের জন্য ওয়্যারহাউজঅ্যাপ সুবিধাজনক।

<u>মুক্ত সফটওয়্যারের সাথেঃ</u>

কিছু দিন আগেই ওয়্যারহাউজঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনের সোর্সকোড উন্মুক্ত করেছে ActiveReload। শুরুতে এটি একটি কর্মাশিয়াল প্রজেক্ট ছিল। এর কমিউনিটি খুব অ্যাক্টিভ, ভিজিট করুন এই লিঙ্ক থেকে: http://help.warehouseapp.com/discussions । এই কমিউনিটি থেকে প্রায় সময়ই ডেভেলপারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

ওয়্যারহাউজঅ্যাপ ডেভেলপারদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। আর কোন কমান্ড লাইন নয়, শুধু ওয়েব থেকেই এর কাজ যাতে সম্পুর্ণও দলের সদস্যদের কোডিং কাজ এর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আরও অনেক ফিচার পরবর্তী রিলিজে যুক্ত হবে। সেইসাথে আপনিও এই কাজে যুক্ত হতে পারেন কারণ, এটি একটি ওপেন সোর্স অ্যাপ্লিকেশন।

আপনার কোডিং অভিজ্ঞতা সুখকর হোক! !

<u>কিছু দরকারী লিঙ্কঃ</u>

Warehouseapp site : http://www.warehouseapp.com
Warehouseapp Help : http://help.warehouseapp.com
ActiveReload : http://www.activereload.net

গিট: অসাধারণ একটি সোর্স কোড ম্যানেজমেন্ট টুল

ম. নাসিমুল হক

একটা প্রোগ্রাম করার জন্য কোড করাটা যত জরুরী, সেই কোড ম্যানেজ করাটা ততটাই জরুরী। একবারে একটা সফটওয়্যার কখনও লিখে ফেলা যায় না। সফটওয়্যার লিখতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। এছাড়া কোন কিছু সম্পাদনা করার পর সেগুলোর ইতিহাস রাখাটাও জরুরী। আরও জরুরী কোন সফটওয়্যারের স্ট্যাবল ভার্সন আর ডেভেলপমেন্ট ভার্সন আলাদা রাখার। এসব কিছু মিলিয়ে সোর্স কোড ম্যানেজ করাটাকে SCM বলে।

মূলত দু'ধরণের সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি আছে। এক, সেন্ট্রালাইজড পদ্ধতি; দুই, ডিস্ট্রিবিউটেড পদ্ধতি। সেন্ট্রালাইজড পদ্ধতিতে সোর্স কোডটা এক জায়গায় থাকে। সেখানে এডমিনরা সোর্স কোড জমা (commit) দিতে পারে। অন্যদিকে ডিস্ট্রিবিউটেড পদ্ধতিতে যেকোন ডেভেলপারের নিজস্ব রিপোজিটরি থাকতে পারে। ফলে নানা ধরণের পরীক্ষা- নিরীক্ষা ডেভেলপার ইচ্ছে করলেই করতে পারে। নতুনদের জন্য কথাগুলো হয়তো মাথার উপর দিয়ে যাবে। তবুও ভুমিকার খাতিরে বলে নিলাম। এখানে আমি ছোট্ট একটা ধারণা দেব git এর উপরে। এটা ডিস্ট্রিবিউটেড পদ্ধতি।

আমি এখানে উবুন্তু ব্যবহার করছি। অন্যান্য ওএসে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হবে ঐ ওএসের নিয়মানুযায়ী।
উল্লেখ্য, $ সাইনটা বোঝাবে কমান্ড প্রম্পট। অর্থাৎ এর পরে যা লেখা হবে সেগুলো কমান্ড। সেটা লিখে রান করতে হবে। আর $ না থাকা মানে সেটা আগের কমান্ডের অউটপুট।

প্রথমে git ইনস্টল করি:

```
$ sudo apt-get install git-core
```

এবারে আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরী করি:

```
$ mkdir myproject
```

এখানে নতুন একটা ফাইল তেরী করি:

```
$ cd myproject
$ touch main.cpp
```

main.cpp ফাইলটা যেকোন এডিটরে ওপেন করে আমাদের কোড লিখি।

```
#include <iostream>

int main() {
 std::cout << "Hello world!" << std::endl;
 return 0;
}
```

আমাদের কোড লেখা শেষ। এখন এটাকে কম্পাইল করা যাবে এবং রান করা যাবে। কিন্তু এখানে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। আমরা এখানে এটা ম্যানেজ করা শিখবো। তবুও আসুন এটাকে কম্পাইল ও রান করি। নিচের কমান্ডগুলো এরকম এক নম্বরে কম্পাইল করলাম যেটা a.out নামে এক্সিকিউট্যাবল ফাইল তৈরী করল, দুই নম্বরে রান করলাম a.out, তিন নম্বরে আউপুট দেখালো।

```
$ g++ main.cpp
$ ./a.out
Hello world!
```

আমরা myproject কে এখন একটা git রিপোজিটরিতে রূপান্তর করবো। এই পুরো প্রজেক্টটা এখন গিট দিয়ে ম্যানেজ হবে। গিট এই প্রজেক্টের সকল ধরণের পরিবর্তন মনে রাখবে। শুরু করা যাক।

```
$ git init
```

myproject ফোল্ডারে থাকা অবস্থায় উপরের কমান্ডটা রান করতে হবে। ফলে .git নামে একটা ফোল্ডার তৈরী হবে যা লুকানো থাকবে। কেননা . দিয়ে শুরু হওয়া যেকোন ফাইল- ফোল্ডার লিনাক্স(ইউনিক্স)- এ লুকানো থাকে। এই ফোল্ডারের ভেতরেই গিট তার সমস্ত কিছু স্টোর করবে।
এবারে দেখি আমাদের রিপোজিটরি কী অবস্থায় আছে।

```
$ git status
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Untracked files:
# (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
# a.out
# main.cpp
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

এখানে git status রান করার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রজেক্টে দুটো ফাইল আছে a.out, main.cpp কিন্তু এরা untracked অবস্থায় রয়েছে। এর মানে হচ্ছে এই প্রজেক্টে আমরা এই দুটো ফাইলকে ইচ্ছে ট্র্যাক করতে পারি। এখন যদি আমরা git add রান করি তাহলে সব ফাইল রিপোজিটরিতে যুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা সেটা চাই না, কারণ a.out বাইনারী এক্সিকিউট্যাবল ফাইল। এটা ম্যানেজ করার কিছু নাই। শুধুমাত্র main.cpp যোগ করি এভাবে –

```
$ git add main.cpp
$ git status
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Changes to be committed:
# (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
#
# new file: main.cpp
#
# Untracked files:
# (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
# a.out
```

এখন স্ট্যাটাস দেখছি যে main.cpp ফাইলটা ট্র্যাকিং- এ যুক্ত হয়েছে কিন্তু a.out হয়নি। এখন মুল কাজ, অর্থাৎ কমিট করা। commit মানে হচ্ছে রিপোতে চালান দেয়া। git add দিয়ে আমরা ট্র্যাকিং যুক্ত করলাম   কিন্তু আসলে রিপোতে যুক্ত করতে হলে আমাদের নিচের কমান্ড রান করতে হবে।

```
$ git commit -m "initial commit"
 1 files changed, 7 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 main.cpp
```

-m "initial commit" হচ্ছে এই কমিটের ম্যাসেজ। প্রত্যেকটা কমিটে কী পরিবর্তন হলো তার ছোট্ট একটা সারাংশ লিখতে হয়, যাতে সহজেই বোঝা যায় কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন যদি আমরা স্ট্যাটাস দেখি তাহলে –

```
$ git status
# On branch master
# Untracked files:
# (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
# a.out
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

দেখছি যে a.out ফাইলটা ছাড়া আমাদের অন্য কোন পরিবর্তন হয়নি প্রজেক্টে। যেহেতু আমরা এটাকে ম্যানেজ করতে চাই না। এটাকে ইগনোর করি সবসময়।

```
$ cat > .gitignore
a.out
.gitignore
Ctrl+D
```

এখানে যেটা করলাম, সেটা হলো .gitignore নামে নতুন একটা ফাইল খুললাম তারপর সেই ফাইলে a.out এবং .gitignore লিখলাম। লেখা শেষে Ctrl+D দিয়ে ফাইল সেভ করে বেরিয়ে গেলাম। এটা এভাবে না করে কোন টেক্সট এডিটরে করলেও চলবে। .gitignore একটা ফাইল, এখানে আমরা যেসব ফাইল ম্যানেজ করতে চাই না, সেসবের লিস্ট রাখব। এবারে যদি স্ট্যাটাস দেখি তবে

```
$ git status
# On branch master
nothing to commit (working directory clean)
```

দেখছি যে কমিট করার কিছু নাই। অর্থাৎ আমাদের প্রজেক্ট ভালোভাবেই ম্যানেজ হয়েছে। এবারে কিছু পরিবর্তন করি কোডে (main.cpp ফাইলে)

```
#include <iostream>

using namespace std;
```

```
int main() {
 cout << "Hello world!" << endl;
 return 0;
}
```

ফাইল সেভ করার পর গিট স্ট্যাটাস দেখি।

```
$ git status
# On branch master
# Changed but not updated:
# (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
# modified: main.cpp
#
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

দারুণ, main.cpp ফাইলটা পরিবর্তিত হয়েছে। দেখি কী পরিবর্তন হয়েছে –

```
$ git diff
diff --git a/main.cpp b/main.cpp
index 8b0efc3..a9f1dce 100644
--- a/main.cpp
+++ b/main.cpp
@@ -1,7 +1,9 @@
 #include <iostream>

+using namespace std;
+
 int main() {
- std::cout << "Hello world!" << std::endl;
+ cout << "Hello world!" << endl;
```

```
return 0;
}
```

আমরা দেখতে পাচ্ছি, দুটো পরিবর্তন হয়েছে + হচ্ছে নতুন লাইন, - হচ্ছে মুছে ফেলা লাইন। এবারে commit করি।

```
$ git commit -a -m "std namespace added to the global scope"
Created commit d8a22d5: std namespace added to the global scope
 1 files changed, 3 insertions(+), 1 deletions(-)
```

দেখতে পাচ্ছি একটা নতুন অপশন যুক্ত হয়েছে -a , এটা মডিফাইড ফাইলগুলোকে যুক্ত করে কমিট করবে। এটা git add এর শর্টকাট। এখন আমরা দেখি কতবার এই গিট রিপোতে কমিট করা হয়েছে, কে করেছে এবং কেন করেছে –

```
$ git log
commit d8a22d57110121ce42ba1c9793ea58f3b02e456a
Author: নাসিম <nasim....@gmail.com>
Date: Thu Aug 7 16:23:39 2008 +0100

 std namespace added to the global scope

commit 317e85121c9955a657822f1d8e2657edac8416ff
Author: নাসিম <nasim....@gmail.com>
Date: Thu Aug 7 15:56:35 2008 +0100

 initial commit
```

ব্যস, শুরু হয়ে গেল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। এটা শুধুইমাত্র বেসিক টিউটোরিয়াল। গিট সম্পর্কে একটা ছোট্ট ধারণা মাত্র। গিট আরও অনেক শক্তিশালী জিনিষ। গিট-এর উপর প্রচুর টিউটোরিয়াল পাওয়া যাবে http://git-scm.org থেকে।

উইন্ডোজ সার্ভার ২০০০/২০০৩ - এ এক্টিভ ডিরেক্টরি

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

কমপিউটার নেটওয়ার্কিং নিয়ে সবারই কম বেশি আগ্রহ রয়েছে। অনেক ধরনের নেটওয়ার্কিং রয়েছে যেমনঃ একাধিক কমপিউটারের মাঝে নেটওয়ার্কিং, ফাইল শেয়ারিং, ইন্টারনেট শেয়ারিং, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, উইন্ডোজ সার্ভার। অফিস বা কম্পানিতে একাধিক কমপিউটারের মাঝে নেটওয়ার্কিং করলে ওই সব কমপিউটার গুলোকে মেইন্টেন্স করার জন্য প্রয়োজন পড়ে সার্ভারের। সার্ভার দিয়ে নেটওয়ার্কের কমপিউটার গুলোকে সহজে মেনেজ করা যায়। আর এই সার্ভার নিয়েই দুটি ধাপে বলা হয়েছে। প্রথমে সার্ভার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তারপর কিভাবে সার্ভারে এক্টিভ ডিরেক্টরি সেটআপ দিতে হয় তার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ক্লাইন্ট- সার্ভার ভিত্তিক প্রতিটি নেটওয়ার্কে একটি করে ডোমেইন কন্ট্রোলার থাকে। উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভার বা ২০০৩ সার্ভারে একে বলা হয় ডোমেইন কন্ট্রোলার বা ডিসি, উইন্ডোজ এনটিতে বলা হয় প্রাইমারি ডোমেইন কন্ট্রোলার বা পিডিসি। ডোমেইন কন্ট্রোলার নেটওয়ার্কের ইউজারসহ অন্যান্য অবজেক্টের ডাটাবেজ ধারন করে থাকে। উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভার বা ২০০৩ সার্ভারে ডোমেইন কন্ট্রোলারকে এমন ভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে যা এক্টিভ ডিরেক্টরির সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম। উন্ডোজ ২০০০ সার্ভার বা ২০০৩ সার্ভারে প্রাইমারি বা ব্যাকআপ ডোমেইন থাকে না, তবে এখানে একটিই ডোমেইন কন্ট্রোলার থাকে যাকে ডিসি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম যখন একক অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে কাজ করে তখন একে স্ট্যান এলোন কমপিউটার বলে যতক্ষন না পর্যন্ত এটি কোনো সার্ভারে যোগ না হয়।

উইন্ডোজ সার্ভারে এক্টিভ ডিরেক্টরি সেটআপ দেয়ার আগে এক্টিভ ডিরেক্টরি কিকি সুবিধা প্রদান করে তা নিচে আলোচনা করা হয়েছেঃ

ক। যেকোন সময়ে সার্ভারে ইউজারের নাম, ছবি বা অন্যান্য তথ্য যোগ করা যায়।
খ। ইউজার, প্রিন্টারের সব রিসোর্সকে এক জায়গায় স্টোর করে রাখা যায়।
গ। একাধিক ডিরেক্টরি এক সাথে একই ডোমেইন কন্ট্রোলারে থাকতে পারে।
ঘ। এডমিনিস্ট্রেটরের ক্ষমতা বিভিন্ন ইউজারের মাঝে সহজে ভাগ করে দেয়া যায় বা একজন ইউজারকে কিছু ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া যায়।

উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভার বা ২০০৩ সার্ভারে এক্টিভ ডিরেক্টরি সেটআপ করতে গেলে নিচের রিকোয়ারমেন্ট গুলো অনুসরন করতে হবেঃ

ক। কমপিউটারের একটি ড্রাইভকে বেশ কিছু জায়গা নিয়ে এনটিএফএস হিসেবে পার্টিশন করতে হবে।
খ। এডমিনিস্ট্রেটর ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড লাগবে,
গ। উইন্ডজের কারেক্ট অপারেটিং সিস্টেম লাগবে,
ঘ। এনআইসি (NIC) কার্ড ও টিসিপি/আইপি,
ঙ। ডিএনএস সার্ভার ইত্যাদি প্রয়োজন। তবে যে ড্রাইভে উইন্ডোজ সার্ভার সেটআপ দিবেন তা যদি এনটিএফএস হিসেবে পার্টিশন দেয়া না থাকে তাহলে এক্টিভ ডিরেক্টরি সেটআপ করতে পারবেন না। ধরে নিচ্ছি সব কিছু ঠিক ঠাক রয়েছে।

উইন্ডোজ ২০০০ এডভান্সড সার্ভার বা উইন্ডোজ ২০০৩ এন্টারপ্রাইজ এডিশনে এক্টিভ ডিরেক্টরি ইন্সটলেশনের জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরন করুনঃ

১। প্রথমে এনটিএফএস ড্রাইভে উইন্ডোজ ২০০০ এডভান্সড সার্ভার বা উইন্ডোজ ২০০৩ এন্টারপ্রাইজ এডিশন ইন্সটল করুন।
২। ইন্সটলেশন শেষ হয়ে গেলে কমপিউটার যখন স্টার্ট হয়ে লগইন স্ক্রিনে আসবে তখন এডমিনিস্ট্রেটরের ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন।
৩। স্টার্টে ক্লিক করে রানে যান। এখানে dcpromo টাইপ করে এন্টার দিন। তাহলে এক্টিভ ডিরেক্টরি ইন্সটলেশন উইজার্ড ওপেন হবে।
৪। প্রাপ্ত উইজার্ড থেকে ডোমেইন কন্ট্রোলার টাইপ সিলেক্ট করতে হবে তাই Domain controller for a new domain সিলেক্ট করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন।
৫। ক্রিয়েট ট্রি অর চাইল্ড ডোমেইন স্ক্রিনে Create a new domain Tree সিলেক্ট করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন। যেহেতু আমরা প্রথমবার এক্টিভ ডিরেক্টরি সেটআপ দিচ্ছি তাই এই অপশনটি সিলেক্ট করে নেক্সট করবো। আর যদি আগে সেটআপ দেয়া ডোমেইনে যুক্ত হতে হলে পরের অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে।
৬। এখানে ক্রিয়েট অর জয়েন ফরেস্ট উইজার্ডে আসবে। এখানে Create a new forest of domain trees সিলেক্ট করে নেক্সট সিলেক্ট করুন। এখানে নতুন ডোমেইনের পাশাপাশি নতুন ফরেস্ট ক্রিয়েট করছেন।

৭। New Domain Name স্ক্রিনে rockingzone.com টাইপ করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন।

৮। নেটবায়োস ডোমেইন নেমে ROCKINGZONE লিখুন বা স্ক্রিনে ডিফল্ট সেটিং টি রেখে নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন।

৯। ডাটাবেজ এন্ড লগ লোকেশন স্কিনের সেটিং ডিফল্ট অবস্থায় রেখে দিয়ে নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন।

১০। এবারের উইন্ডোতে শেয়ারড সিস্টেম ভলিউম সংরক্ষন সংক্রান্ত। এখানে যা থাকবে তাই ডিফল্ট হিসেবে রেখে নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন।

১১। সিস্টেমে ডিএনএস সার্ভার লোড করা না থাকে তাহলে এরর মেসেজ পাবেন। প্রথমবার যেহেতু এক্টিভ ডিরেক্টরি সেটআপ করতে যাচ্ছেন তাই আপনাকে ডিএনএস লোড করতে হবে। ডিএনএস কনফিগারেশনে দুটি অপশন আপনাকে দিবে। একটিতে বলা হবে এখনই ডিএনএস সেটআপ ও কনফিগার করা নিয়ে। অন্যটিতে বলা হবে যদি আপনি পরে ডিএনএস সেটআপ দিবেন কিনা সেই ব্যপারে। ধরে নিচ্ছি এখনই ডিএনএস সেটআপ দিবো। তাই Yes, install and configure DNS on this computer সিলেক্ট করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন। ১২। নেক্সট বাটনে ক্লিক করে পারমিশন উইন্ডো আসবে। এখানে Permissions compatible with pre-Windows 2000 server সিলেক্ট করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন।

১৩। এখানে ডিরেক্টরি সার্ভিস রিস্টোর মোডের জন্য এডমিনিস্ট্রেতর পাসওয়ার্ড দিতে হবে। ইচ্ছে করলে আপনি পাসওয়ার্ড না দিয়েই নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে পারেন।

১৪। সামারির একটি উইন্ডো ওপেন হবে। যেখানে আপনার দেয়া সেটিং গুলো দেখাবে। কোনো পরিবর্তন করার দরকার হলে ব্যাক বাটনে ক্লিক করে পরিবর্তন করে নিন। যদি নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন তাহলে এক্টিভ ডিরেক্টরি ইন্সটলেশন শুরু হবে যা শেষ হতে বেশ কিছু সময় লাগবে। ইন্সটলেশন শেষ করতে উইন্ডোজ ২০০০ এডভান্সড সার্ভারের বা উইন্ডোজ ২০০৩ এন্টারপ্রাইজ সার্ভারের i386 ফোল্ডারটির প্রয়োজন পড়বে। তা দিয়ে ইন্সটলেশন শেষ করে ফিনিশ বাটনে প্রেস করুন।

১৫। এক্টিভ ডিরেক্টরিকে কার্যকর করতে উইন্ডোজকে রিস্টার্ট করুন।

লক্ষ্যনীয়ঃ

উইন্ডোজ ২০০০ এডভান্সড সার্ভারের মতো উইন্ডোজ ২০০৩ এন্টারপ্রাইজ এডিশনে এক্টিভ ডিরেক্টরি সেটআপ করা যায়। তবে ১২ নম্বর ধাপে পারমিশন উইন্ডোতে Permissions compatible with pre-Windows 2000 server এর সাথে Windows Server 2003 servers or operating অপশনটি থাকবে। যা সিলেক্ট করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করলে রিস্টোর মোডে এডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড উইন্ডো আসবে। যেখানে আপনাকে একটি পাসওয়ার্ড অবশ্যই দিতে হবে যা কিনা উইন্ডোজ ২০০০ এডভান্সড সার্ভারে না দিলেও হতো।

এক্টিভ ডিরেক্টরি ও ডিএনএস পরীক্ষাঃ

উইন্ডোজ ২০০০ এডভান্সড সার্ভারে এক্টিভ ডিরেক্টরি সেটআপ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে স্টার্ট থেকে প্রোগ্রামসের মাধ্যমে এডমিনিস্ট্রেটর টুলসে যান। এখানে এক্টিভ ডিরেক্টরি সংক্রান্ত কয়েকটি ফাইল থাকবে এবং ডিএনএস সেটআপ হয়ে থাকলে এখানে ডিএনএস এর নামও থাকবে। এক্টিভ ডিরেক্টরির সেটআপ কনফার্ম হওয়ার জন্য স্টার্টে গিয়ে রানে যান। এখানে dsa.msc টাইপ করে এন্টার দিন। তাহলে এক্টিভ ডিরেক্টরি ইউজারস এন্ড কমপিউটারসের উইন্ডো ওপেন হবে যেখানে এক্টিভ ডিরেক্টরির সব কন্টেইনার এবং অরগানেশনাল ইউনিট (OU) থাকবে।

ছবি ১- এক্টিভ ডিরেক্টরি ইউজার ও কমপিউটার

ডিএনএস সার্ভিস পরীক্ষা করতে নিচের ধাপ গুলো অনুসরন করুনঃ

উইন্ডোজ ২০০০ এডভান্সড সার্ভারে ডিএনএস সেটআপ ঠিকমতো হয়ে থাকলে এডমিনিস্ট্রেটর টুলসে ডিএনএস সার্ভিসটি থাকবে। এই সার্ভিসে ক্লিক করে ফরওয়ার্ড লুকআপ জোন এবং রিভার্স লুকআপ জোন চেক করে নিন।

উইন্ডোজ ২০০৩ এন্টারপ্রাইজ এডিশনের এডমিনিস্ট্রেশন টুলস থেকে ডিএনএস কনসোলটি চালু করুন। এবার এখানে ফরওয়ার্ড লুকআপ জোনের ডোমেইন নেম- এ rockingzone.com এর মধ্যে _msdcs ফাইলটি আছে কিনা তা নিশ্চিত হোন যা এক্টিভ ডিরেক্টরির জন্য অত্যান্ত গুরুত্তপূর্ণ। আপনার সার্ভারটি ঠিকমতো ডোমেইন কন্ট্রোলারে পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য মাই কমপিউটারের উপর রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজ- এ গেলেই দেখতে পারবেন।

উবুন্টু যে কারণে উইন্ডোজ নয়

অভ্র নীল

অনেককেই বলতে শোনা যায় যে "...আর বলেন না ভাই, লিনাক্সে কয়েকদিন ছিলাম, খুবই ভেজালের জিনিস, এত্ত কঠিন যে বহুত সমস্যা হয়। পরে আবার উইন্ডোজে ফেরত আসছি..."। এই "বহুত সমস্যাটা" আসলে কি? এতই যদি সমস্যা হয় তাহলে পৃথিবীর তাবৎ সার্ভারগুলো লিনাক্সে চলতনা। এমনকি খোদ মাইক্রোসফটও তাদের সার্ভার লিনাক্সে চালাতোনা। ভাবছেন ভুল পড়ছেন? নাহ, আপনি ঠিকই পড়েছেন, মাইক্রোসফট নিরাপত্তার জন্য তাদের নিজেদের সার্ভারের বদলে লিনাক্সের সার্ভার ব্যবহার করে! তাহলে চিন্তা করে বলুনতো আসলেই কি লিনাক্স খুবই সমস্যাময়?

শুরুর কথা

বেশিরভাগ সাধারন কম্পিউটার ইউজারের উইন্ডোজ থেকে লিনাক্সে আসার পিছনে দুইটা কারন কাজ করে। এক নম্বর কারন হচ্ছে লিনাক্স ফ্রি, কিনতে বা ব্যবহার করতে কোন পয়সা খরচ হয়না, খালি যোগাড় করে এনে চালালেই হল, যেখানে প্রচুর টাকা খরচ করে উইন্ডোজ কিনতে হয়। দুই নম্বর কারন হচ্ছে এই ইউজাররা মনে করে লিনাক্স হচ্ছে উইন্ডোজের উন্নতর সংস্করন, ফলে তারা উইন্ডোজে যে জিনিস যেভাবে পেয়ে এসেছে লিনাক্সে সেই একই জিনিস ঠিক সেভাবেই পেতে চায়। সমস্যাটা এই দুই নম্বর কারনেই, কারন লিনাক্স কতটুকু উন্নত সেটা তারা বিচার করে উইন্ডোজের সাথে লিনাক্সের কতটুকু মিল আছে, তার উপর ভিত্তি করে। এই খানে তাদের নিরাশ হতে হয় কারন সহজ বাংলায় বললে বলতে হয় যে লিনাক্স মোটেও উইন্ডোজ নয়।

লিনাক্স মোটেও উইন্ডোজ নয়

লিনাক্স মোটেও উইন্ডোজ মত না, বরং এটা দাম, পারফরম্যান্স, সিকিউরিটি সবদিক দিয়েই উইন্ডোজ থেকে একেবারেই ভিন্ন একটা অপারেটিং সিস্টেম। বেশিরভাগ সাধারন কম্পিউটার ইউজাররা এই ভিন্নতাকে তো বুঝতে চায়ইনা বরং উল্টো তারা এই ভিন্নতাকেই "বহুত সমস্যা"র জন্য দোষারোপ করে। তারা বুঝতে চায়না যে, কোন জিনিসের কপি কখনোই আসল জিনিসের চেয়ে উন্নত হতে পারেনা, বড়জোর সমান সমান হতে পারে। একটা জিনিসকে আরেকটা থেকে উন্নত হতে হলে অবশ্যই দুটোকে ভিন্ন হতে হবে।

উদাহরন হিসেবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আর ফায়ারফক্স ব্রাউজার দুটার কথা বলা যায়। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় আর বহুল ব্যবহৃত ব্রাউজারের নাম বললেই চলে আসে ফায়ারফক্সের কথা। ফায়ারফক্স হচ্ছে সেই ব্রাউজার যেটা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের দূর্গকে ঝড়ের গতিতে গুড়িয়ে দিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার থেকে ফায়ারফক্সের ভিন্নতার কারনে। একই উইন্ডোতে অনেকগুলো ট্যাবের অপশন, সুরক্ষিত সিকিউরিটি, সাবলীল ফাইন্ড অপশন, বিল্টইন সার্চবারসহ শতশত কাজের এডঅন অল্পদিনেই ফায়ারফক্সকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারিদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। ফায়ারফক্স যদি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের কপি-পেষ্ট কোন কিছু হত তবে কি কখনো এই সাফল্য সম্ভব হত? কখনোই না! লিনাক্স আর উইন্ডোজের জন্যও একই কথা খাটে। উইন্ডোজের ক্লোন না বলেই লিনাক্সের এত নাম ডাক। উইন্ডোজেরও ক্লোন আছে। কিন্তু উইন্ডোজের ক্লোন হিসেবে পরিচিত "রিয়েক্ট ওএস" এর নামই বা কয়জন শুনেছে?

তাই উইন্ডোজ থেকে লিনাক্সে আসা মানে ভিন্নতার এক নতুন উন্নত দুনিয়ায় আগমন আপনি যদি এখনো এই লেখাটা পড়তে থাকেন তাহলে ভিন্নতার এই নতুন দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগতম!

ভিন্নতার দুনিয়া

লিনাক্স উইন্ডোজ থেকে একটু আধটু নয় বরং পুরোপুরি ভিন্ন! এই ভিন্নতার ছোট্ট একটা উদাহরন দেই। টেকনিক্যাল জগতে "আউট অফ বক্স-কন্ডিশন" বেশ পরিচিত একটা শব্দ, এর মানে হচ্ছে মাত্র কেনা কোন প্রোডাক্টকে প্যাকেট থেকে বের করার পর পরই এর থেকে কি ধরনের সুবিধা আপনি পেতে পারেন। অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে বলা যায় একটা ওএস ফ্রেশ ইনস্টল করার পর সেটা দিয়ে কি কি করা সম্ভব। একজন উইন্ডোজ ব্যবহারকারি উইন্ডোজ ইন্সটল করেই যে যে সুবিধাগুলো পাবেন তা হল: ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, আউটলুক এক্সপ্রেস, লেখালেখি করার জন্য ওয়ার্ডপ্যাড এবং নোটপ্যাড (অফিস কিন্তু আলাদা ইন্সটল করতে হয়), আঁকাআকি করার জন্য এমএস পেইন্ট আর গান বা মুভি দেখতে মিডিয়া প্লেয়ার। অন্যদিকে একজন লিনাক্স ব্যবহারকারি প্রথমেই পাচ্ছেন উবুন্টু, ফেডোরা, ডেবিয়ান, সুসে, রেডহ্যাট ইত্যাদি প্রায় শ'খানেক ডিস্ট্রো থেকে কোন "আউট অফ-বক্স" ডিস্ট্রো ব্যবহার করবেন সেই অপশন। যেকোন একটা ডিস্ট্রো বেছে নেবার পর ইন্সটল করেই পাচ্ছেন ডিস্ট্রো অনুযায়ী গানোম বা কেডিই বা ফ্লাক্সবক্সের মত চোখ আটকে থাকার মত ডেস্কটপ, ওপেন অফিস বা কেঅফিসের মত অফিসের পুরো স্যুট, গেডিট বা কেট বা ইম্যাক্স বা ভাইমের মত টেক্সট এডিটর, ব্রাউজার হিসেবে ফায়ারফক্স বা অপেরা বা কংক্যুয়েরর, আঁকাআকি বা ছবি এডিট করার জন্য গিম্প আর গান বা মুভির জন্য সফটওয়্যার তো আছেই, সংগে থাকে কাজের আরো সফটওয়্যার।

সাধারনভাবেই একজন উইন্ডোজ ব্যবহারকারি এতগুলো অপশনের সাথে পরিচিত নন। ফলে তার মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক "আসলেই কি এত অপশনের দরকার আছে?"। আরো সহজ ভাবে বললে প্রশ্নটার মানে দাঁড়ায় "লিনাক্সের কি উইন্ডোজ থেকে ভিন্ন হওয়া খুব জরুরি?"। আসলেই তো, ভিন্ন হবার দরকার কি? কারন শেষমেশে সবই তো অপারেটিং সিস্টেম, এদের সবার কাজ একই, আর তা হল ব্যবহারকারিকে তার কম্পিউটারে বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন চালাতে সাহায্য

করা। তাহলে কেন এই ভিন্নতা? ভিন্ন নাহলে কত সহজেই তো ব্যবহার করতে পারা যেত!

ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখি। ধরুন আপনি ক থেকে খ স্থানে যাবেন। কাজটা আপনি সহজেই করতে পারেন। আপনি একটা মোটরবাইক করে ক থেকে খ স্থানে চলে গেলেন। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন রাস্তায় কিন্তু বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ডিজাইনের মোটরবাইক চলে, সবগুলোর কাজই কিন্তু যাত্রী বহন করা, তাহলে ডিজাইন ভিন্ন কেন? আপনি হয়ত বলবেন ডিজাইন তো কেবল বাইরেই ভিন্ন, ভিতরের যন্ত্রপাতির ফাংশন তো সবগুলোর একই! কথা এক্কেবারে ঠিক! আচ্ছা আপনি কি খেয়াল করেছেন সবাই কিন্তু মোটরবাইক চালায় না, কেউ কেউ কিন্তু কারও চালায়। মোটরবাইক বা কার দুটোরই একই কাজ কিন্তু ডিজাইন থেকে শুরু করে ভিতরের যন্ত্রপাতির ফাংশন সবই কিন্তু আলাদা!

উইন্ডোজের এক ভার্সন থেকে আরেক ভার্সনে যাওয়া হচ্ছে একটা মোটরবাইক থেকে আরেকটাতে যাবার মত, তেমন একটা পার্থক্য নাই, যে আগেরটা ব্যবহার করতে পারে সে নতুনটা ভার্সনটাও ব্যবহার করতে পারবে। উইন্ডোজ থেকে লিনাক্সে আসা মানে মোটরবাইক থেকে কারে আসা, অর্থ্যাৎ অনেক পার্থক্য অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এরা দুটোই ওএস/ যানবাহন, এদের দুটোই হয়তো একই হার্ডওয়্যার/ রাস্তা ব্যবহার করে, দুটোই হয়তো পিসিতে কোন এ্যাপ্লিকেশন রান করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার কাজ করে/ আপনাকে ক থেকে খ স্থানে নিয়ে যাবে; কিন্তু এদের কাজের পদ্ধতি গোড়া থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন।

- উইন্ডোজ/ মোটরবাইক কিন্তু ভাইরাস/ চোরের কাছ থেকে ততক্ষন নিরাপদ না যতক্ষন না আপনি এন্টিভাইরাস / চাকায় তালা না লাগাচ্ছেন।
- লিনাক্সে / কারে আগে থেকেই কঠিন সুরক্ষা / লকসহ দরজা দেয়া থাকে, তাই কোন এন্টিভাইরাস / চাকায় তালা লাগেনা, ফলে লিনাক্স / কার সবসময় ভাইরাস / চোর থেকে নিরাপদ।
- লিনাক্স / কার ডিজাইন করা হয়েছে অনেক ব্যবহারকারি / যাত্রীর কথা মাথায় রেখে, যেখানে উইন্ডোজ / মোটরবাইক ডিজাইন করা হয়েছে মূলত একজন ব্যবহারকারি / যাত্রীর জন্য।

দুটা সিস্টেমের কাজের ধরন ভিন্ন হলেও এরা কিন্তু আসলে একই কাজ সম্পন্ন করছে, সেটা হচ্ছে কম্পিউটার চালানো / পরিবহন করা। তবে এটা ঠিক যে যখন আপনি মোটরবাইক আর কারের মধ্যে যান পরিবর্তন করবেন তখন অনেক কিছুই পাল্টায়না, যেমন দুটোকেই চালানোর জন্য জ্বালানী ভরতে হবে, দুটোর জন্যই একই ট্রফিক আইন মেনে চলতে হবে, মোড় নেবার আগে দুটোতেই ইন্ডিকেটরে সিগনাল দিতে হয়। আবার অনেক জিনিস পাল্টে যায়, যেমন কারের আরোহীদের হেলমেট পড়তে হয়না, মোটরবাইকের আরোহীদের সিটবেল্ট বাধতে হয়না; স্পিড বাড়াতে হলে কারের ড্রাইভারকে পা দিয়ে ফুট- প্যাডেল চাপতে হয় যেখানে মোটরবাইকের ড্রাইভারকে হাত দিয়ে হ্যান্ডেল ঘোরাতে হয়; মোড় নেবার সময় কারের ড্রাইভার কেবল স্টিয়ারিং ঘুরিয়েই মোড় নেয় যেখানে মোটরবাইকের ড্রাইভারকে একপাশে একটু কাত হয়ে এই একই কাজ করতে হয়।

এখন কোন মোটরবাইক আরোহী যদি কার চালাতে গিয়ে মোড় নেবার সময় কাত হয়ে মোড় নিতে যায় তবে কিন্তু সে খুব দ্রুত দুর্ঘটনায় পড়বে। মোটরবাইক চালানোর জ্ঞান দিয়ে কার চালানো অসম্ভব। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে যখন কোন উইন্ডোজ ব্যবহারকারি তার উইন্ডোজের জ্ঞান দিয়ে লিনাক্স আয়ত্ত্ব করতে যায়। লিনাক্সকে উইন্ডোজের মত একই কায়দায় চালানো সম্ভব নয় এটা বুঝতে পারার পরই উইন্ডোজ ব্যবহারকারিরা ঘোষনা দেয় যে "লিনাক্স এখনো ডেস্কটপের জন্য রেডি নয়"! কিন্তু দেখা যায় যে যার লিনাক্স বা উইন্ডোজ নিয়ে কোন ধারনা নেই তাকে লিনাক্সে কম্পিউটিং এর হাতেখড়ি দিলে সে কিন্তু খুব সহজেই লিনাক্সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আসলে 'ভিন্নতা' জিনিসটা শেখার বিষয়, নতুন কোন কিছুতে অভ্যস্ত হতে হলে সেটাকে একদম শূণ্য থেকে শুরু করতে হয়। শুধু মনে রাখতে হবে যে উইন্ডোজ আর লিনাক্স এক জিনিস না। এই ভিন্নতার বাধা অতিক্রম করতে হলে শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে। শূন্য থেকে শুরু করলে লিনাক্সের সংস্কৃতির সাথে অভ্যস্ত হওয়া কোন ব্যাপারই না। ও আচ্ছা ভালো কথা, আপনি কি জানেন যে অপারেটিং সিস্টেমগুলোর আলাদা আলাদা সংস্কৃতি আছে?

অপারেটিং সিস্টেম সংস্কৃতি

উইন্ডোজের সংস্কৃতি পুরোটাই ক্রেতা-বিক্রেতা নির্ভর। একজন ব্যবহারকারিকে পয়সা খরচ করে সফটওয়্যার, ওয়ারেন্টি, সাপোর্ট ইত্যাদি কিনতে হয়। তাই একজন ব্যবহারকারি স্বাভাবিকভাবেই ঐ সফটওয়্যারের মধ্যে তার উপযোগী একটা নির্দিষ্ট লেভেলের ব্যবহারযোগ্যতা প্রত্যাশা করতেই পারে। তাছাড়া যেহেতু পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে তাই ঐ সফটওয়্যারের যেকোন টেকনিক্যাল সাপোর্ট তারা দাবী করতেই পারে। উইন্ডোজ সংস্কৃতিতে সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারিরা কম্পানির সাথে সরাসরি চুক্তিবদ্ধ থাকে এবং কম্পানি তাদের সব ধরনের সাহায্য করতে বাধ্য।

লিনাক্সে ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে সবাই একটা কমিউনিটির অংশ। এই কমিউনিটির সদস্যদের সফটওয়্যার কেনার কোন দরকার নাই, তারা বিনাপয়সায় সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নেয়। তারা পয়সা দিয়ে টেকনিক্যাল সাপোর্ট কেনেনা বরং যেকোন টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য তারা কমিউনিটির অন্য সদস্যদের সাথে ফোরামের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। এক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক থাকে সত্যিকারের মানুষের সাথে, কোন কম্পানির সাথে না।

উইন্ডোজ ব্যবহারকারিরা লিনাক্সে এসে এই কমিউনিটির ব্যাপারটায় সমস্যায় পড়েন। কারন তারা সবসময় "চাহিবামাত্র" সাহায্য পেয়ে অভ্যস্ত, তাই দেখা যায় যে অনেকেই ফোরামে সাহায্য "প্রার্থনা" না করে "দাবী" করে বসে। তারপর সাথে সাথে সমাধান না পেলে "লিনাক্স ফালতু" বা "এখানে কারো সাহায্যের মনোভাব নাই" এসব বলে অভিযোগ করেন। তারা এটা বুঝতে চায়না যে তারা লিনাক্সে যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট পাচ্ছে সেটা পুরোপুরি বিনাপয়সায়, যারা সাহায্য করছে এর মধ্যে তাদের কোন লাভ নেই, তারা এখানে সহৃদয়বান কিছু স্বেচ্ছাসেবক মাত্র যারা অন্যদের সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে আছে। সাহায্য করতে তাদের কিছু সমসয় বেশি লাগতেই পারে সেজন্য অভিযোগ করাটা কি শোভা পায়? আরেকটা ব্যাপার হল, ফোরামে নিবন্ধন করা মানেই এই না যে আপনি শুধু সাহায্য নিবেনই

দিবেননা। অন্যের সমস্যায় সাহায্য আপনাকেও করতে হবে। আর একে অপরকে সাহায্য করার এই মানসিকতাই কিন্তু লিনাক্সকে দিনে দিনে শক্তিশালী ও ব্যবহারবান্ধব করে তুলছে।

ব্যবহারবান্ধব বা ইউজার-ফ্রেন্ডলিনেস

ব্যবহারবান্ধব আসলে কি? কোন সফটওয়্যারই কিন্তু জন্ম থেকেই ব্যবহারবান্ধব থাকেনা। ব্যবহার করতে করতে সেটা ব্যবহারবান্ধব হয়ে যায়। ধরুন কেউ সারা জীবন কেবল টেক্সট এডিটর ব্যবহার করে গেল। তার জন্য কিন্তু মাউসের চেয়ে বিভিন্ন কিবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করাটা বেশি সুবিধাজনক। কারন যেহেতু সে টেক্সট এডিটরে একজন এক্সপার্ট কিবোর্ড শর্টকাট ব্যবহারে তার কাজ অনেক বেশি সহজ হয়। তার জন্য টেক্সট এডিটরে কিবোর্ডের সাপোর্ট থাকাটাই হচ্ছে ইউজার-ফ্রেন্ডলিনেস। আবার যে টেক্সট এডিটর কালেভদ্রে ব্যবহার করে, তার জন্য কিবোর্ড শর্টকাট প্রয়োগ করা বেশ কঠিন কাজ, বরং তার কাছে মাউস দিয়ে কাজ করাটা সুবিধাজনক। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইউজার-ফ্রেন্ডলিনেস আসলে একটা আপেক্ষিক বিষয়।

তাহলে ইউজার-ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যার আসলে কি? সংজ্ঞানুসারে বলা যায় যে সফটওয়্যার ব্যবহার করতে একজন ব্যবহারকারির মোটামুটি লেভেলের জ্ঞান থাকলেই চলে এবং যেটা ব্যবহার করতে ঐ সফটওয়্যার সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়েনা, সেটাই ব্যবহারবান্ধব সফটওয়্যার। কিন্তু আসলে হওয়া উচিত যেটা ব্যবহারে ঝক্কি কম সেটাই ইউজার ফ্রেন্ডলি!

এবার আসুন উইন্ডোজ আর লিনাক্সের সামান্য দুটো টেক্সট এডিটর তুলনা করি। উইন্ডোজের নোট প্যাড তো সবার কাছেই পরিচিত, লিনাক্সের জন্য জনপ্রিয় একটা টেক্সট এডিটর হচ্ছে ভিম (Vim)। নোট প্যাড কোন লেখা কাট-পেস্ট করতে হলে Ctrl-X আর Ctrl-V ব্যবহার করতে হয়। একই কাজ ভিমে করতে গেলে ব্বহার করতে হবে "d" আর "p"। "d" আর "p" দিয়ে যে delete আর paste বোঝায় এটা বুঝতে কোন সমস্যা হবার কথা না কিন্তু আগে থেকে না জানলে কারো বোঝার উপায় নাই যে Ctrl-X আর Ctrl-V দিয়ে ডিলিট আর পেস্ট বোঝায়। কিন্তু কেউ বলেনা যে ভিম ইউজার-ফ্রেন্ডলি? অবাক ব্যাপার না! আসুন আরো একটু দেখি। কিবোর্ড ব্যবহার করে Ctrl-X দিয়ে কোন শব্দকে মুছে ফেলার নিয়ম কি? শব্দটার শুরুতে কার্সর নিয়ে Ctrl-Shift-Right চেপে আগে শব্দটা সিলেক্ট করতে হবে তারপর Ctrl-X চেপে কাট করতে হবে। ভিমে কিভাবে করবেন? শুধুমাত্র dw (Delete Word). Ctrl-X দিয়ে পাঁচটা শব্দ কিভাবে মুছবেন? প্রথমে প্রথম শব্দটার শুরুতে কার্সর নিতে হবে তারপর (Ctrl-Shift-Right)+(Ctrl-Shift-Right)+(Ctrl-Shift-Right)+(Ctrl-Shift-Right) + (Ctrl-Shift-Right) + (Ctrl-X) । আর ভিমের নিয়মটা কি? শুধু d5w। এখন বলুন তো কোনটা বেশি "ইউজার ফ্রেন্ডলি"?

লিনাক্স এককালে গিক শ্রেনীর লোকদের জন্য ব্যবহারবান্ধব ছিল বলা যায়। এখনো "লিনাক্স ইউজার" নাম শুনলেই অনেকের মনে ভেসে উঠে হলিউডি মুভির খোচা খোচা দাড়ির উস্কোখুস্কো চুলের মোটা চশমা পড়া কোন কম্পিউটার গিকের ছবি! লিনাক্সের সেইদিন আর নাই। এখন যে কেউ লিনাক্স ইন্সটল করে এর চেহারা দেখেই ব্যবহার শুরু করতে পারবে। এর গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস সম্পর্কে সোজা বাংলায়

বললো বলতে হয় একেবারে "জলবৎ তরলং"! লিনাক্সের ইউজার ফ্রেন্ডলিনেসের আরেকটা উদাহরন দেই। উইন্ডোজে কোন প্রোগ্রাম, ধরুন মাল্টিমিডিয়ার জন্য বিখ্যাত ভিএলসি প্লেয়ার, ইন্সটল করতে হলে প্রথমে সেটাপ ফাইল জোগাড় করতে হয়, তারপর সেটা ওপেন করে একগাদা নেক্সট বাটন ক্লিক করে তারপর ইন্সটল করতে হয়। আর লিনাক্সে কি করতে হয়? সফটওয়্যার চ্যানেলে গিয়ে ভিএলসির পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে ইন্সটলের অপশনে ক্লিক করলেই কাজ শেষ! আরো সহজে করতে চান? তাহলে টার্মিনালে কেবল মাত্র একটি লাইন লিখুন: *sudo apt-get install vlc*, ব্যস আপনার কাজ শেষ, পুরো সফটওয়্যার ইন্সটল হয়ে আপনার কাজ করার জন্য রেডি হয়ে থাকবে! তাহলে বলুন কোথায় আপনার কষ্ট কম হচ্ছে? লিনাক্সে না উইন্ডোজে? এখন তাহলে কি বলবেন? লিনাক্স শেখাটা কষ্ট?

লিনাক্স শিখতে কষ্ট?

একবার ভাবুনতো, যখন প্রথম উইন্ডোজ চালানো শুরু করেন তখন উইন্ডোজের পিছনে কতটুকু সময় দিতেন! লিনাক্স শিখতে কিন্তু আপনার অত সময় দেবার দরকার নেই, যেহেতু আপনার আগেই অন্য আরেকটা ওএস নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, সেহেতু কম্পিউটারের বেসিক জিনিস নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবেনা। আর লিনাক্সের ডেস্কটপগুলো ইদানিং এত দৃষ্টি নন্দন হয়েছে যে অনায়াসে ম্যাকিনটশের সাথে পাল্লা দিতে পারে, উইন্ডোজ তো পরের কথা। আর কমান্ড লাইনের কথা বলছেন, ভাবছেন একের পর এক কমান্ড দিয়ে কাজ করে যেতে হবে? তাহলে ওটাকে ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখুননা। দৈনন্দিন কাজের জন্য আপনি কমান্ড প্রম্পটকে ভুলে যেতে পারেন, এমনকি কিছু কিছু ডিস্ট্রি ইন্সটল করার জন্য পর্যন্ত কমান্ডের কোন প্রয়োজন নেই। যদিও কমান্ড প্রম্পটই লিনাক্সের আসল সৌন্দর্য!

শেষের কথা

গাড়ির সাথে তুলনা দিয়ে শুরু করেছিলাম, শেষও করছি গাড়ির সাথে তুলনা দিয়ে। উইন্ডোজ ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি চালানো, যেখানে আপনি পিছনে বসে থাকবেন আর ড্রাইভার আপনাকে গাড়ি চালিয়ে আপনাকে ঘোরাবে। আপনার নিজের গাড়ি অথচ আপনি জানেনেই না কিভাবে সেটা চালাতে হয়। আর লিনাক্স ব্যবহার করা মানে হচ্ছে চাবি নিয়ে নিজেই ড্রাইভিং সিটে বসে পড়া। নিজের গাড়ি নিজের মত করে চালানো। লিনাক্স আপনাকে ড্রাইভিং উপভোগ করার স্বাদটা চেখে দেখার সুযোগ করে দেয়।

পথচারী

হুমায়রা হারুন

ম্যাথ ক্লাব থেকে বের হতে হতে রাত প্রায় সাড়ে আট টা। শীতের সময় সন্ধ্যা নামে বিকেল চারটায়। মন্ট্রিয়লের জনাকীর্ণ রাস্তা শশ্মান হয়ে যায় সন্ধ্যা সাতটার মাঝেই। ক্লাব থেকে রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর হাঁটলেই নিগারের বাসা। রাতে রাস্তার সোডিয়াম বাতিগুলো হলুদ আভা ছড়িয়ে সারা অন্ধকারকে যেন হলদেটে করে রাখে। নিগার ছন্দে ছন্দে পা ফেলে যখন এগুতে থাকে, বাতাসের ঝাপটায় তার জ্যাকেটের হুড টুপ্ করে খুলে যায়। চিলিং কোল্ড। সহনীয় নয়। আবার কাঁধের ব্যাগটা সরিয়ে জ্যাকেটের হুডটা দিয়ে মাথাটা ঢেকে ফেলে সে। মাঝে মাঝে দ্রুত হাঁটে , মাঝে মাঝে ধীরে। বাড়ী পৌঁছাতে হয়তোবা মিনিট দশেক। ঘড়িতে দেখে নিল সময়টা ভাল করে। রাত সাড়ে আট টা। ও যাচ্ছে সেইন্ট কেভিন সড়ক ধরে পূর্বদিকের ইসাবেলা রাস্তায়। এটাই তার বাড়ী ফেরার রুটিন। কারণ তথ্যটা এভাবেই নির্ধারিত করা। অর্থাৎ নিগার সেইন্ট কেভিন রাস্তা ধরে এগুবে ইসাবেলা সড়ক অভিমুখে রাত আট টা তিরিশে । জনমানবহীন রাস্তায় নিগার প্রতি পদক্ষেপ রেখে চলবে মিনিট দশেক তার গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্যে। রাস্তার দু ধারের দৃশ্যটাও এমনি। হলদেটে আভায় জনমানবহীন পথ। নিগার হেঁটে যাবে ওর বাসার দিকে। সেসময় নিগার ছাড়া আর অন্য কিছুরই উপস্থিতি থাকবে না ও পথে।

কিন্তু কার কাছে রয়েছে এ সকল তথ্য? তার কাছে যে হয়তো বা ঘটাবে এ ঘটনাটি। তা না হলে নিগার বাড়ী ফিরবেই বা কি করে? ওর নাম ভি- ওয়ান। সকলের বাড়ী ফিরবার ঘটনা ও- ই তৈরী করে থাকে যেমন কিনা মি. পার্কার, যিনি বাড়ী ফিরেন তার ডেলিভারি অর্ডার শেষ করে শীতের রাতে টরন্টোর নির্জন রাস্তা ধরে । তার এই মিনি ভ্যানটা চালাচ্ছেন আজ প্রায় ত্রিশ বছর। এই দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তায় চালক হিসেবে তার রিপোর্ট একদম ক্লিন। কোন অ্যাকসিডেন্টের ঘটনা নেই, স্পিডিং এর ইতিহাস নেই। ট্র্যাফিক পুলিশের নজরদারীতেও পড়েন নি। একজন পাকা ড্রাইভার হিসেবে নিজে খুবই আত্মবিশ্বাসী। চারিদিক খেয়াল করে দায়িত্বের সাথে গাড়ি চালনার অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা অর্জন করেছেন দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে। এই গুণাবলী মি. পার্কারের সেই ছোটবেলা থেকেই। হাইস্কুল শেষে ডেলিভারি ম্যানের কাজটা যখন নিলেন তখন তার বয়স সবে আঠার। তারুণ্যের উদ্দীপনা থাকলেও তা তিনি গাড়ি চালনার ক্ষেত্রে প্রকাশ করেন নি কখনো। আর দেখতে দেখতে এখন ত্রিশটি বছর পার হয়ে গেছে। টরোন্টো শহর জনবহুল হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রসার লাভ করেছে। জীবন যাত্রার পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু কাজ শেষে তার বাড়ী ফিরবার পথটা সেই একই রকম আছে। কারণ ভি- ওয়ান এর কোন পরিবর্তন ঘটায় নি। তাই মি. পার্কার নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ী ফিরেন প্রতি রাতে তার কাজ শেষে। নিয়ন আলোয় রাস্তাটা হাল্কা ধোয়াটে দেখায়। এই রাস্তার দুটি ক্রসিং পেরুলেই তার বাড়ী ব্র্যাডফোর্ড প্লেইসে। এখানে সব মিলিয়ে আগে ছিল পাঁচটি পরিবার। তারপর প্রতিবেশীরা এ জায়গা ছেড়ে বিস্তৃত টরোন্টোর ব্যাপৃত বাণিজ্য কেন্দ্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন ধীরে ধীরে। এখন ব্র্যাডফোর্ড প্লেইসে মি.

পার্কার একাই বাস করেন। মাসের শেষ সপ্তাহে ভাইঝি আসে তার সাথে দেখা করতে। ও থাকে মন্ট্রিয়লে। হাইস্কুলে সবে মাত্র উঠেছে। নাম নিগার। ম্যাথে খুব ভাল। ম্যাথ ক্লাবের মেম্বারও। ব্যস্ত থাকে ভীষণ। তারপরও মাসের শেষ সপ্তাহান্তে তার এখানে আসা চাই। সাত ঘন্টার বাস জার্নি। গ্রে- হাউন্ডের বাস জার্নি যদিও খুব ভাল তবুও ক্লান্তি নেই মেয়েটার। প্রভিন্স দুটোর দূরত্ব ৩১৩ মাইলের কিছু বেশী। শনিবার দুপুরে পৌঁছাবে আবার রবিবার দুপুরে রওনা দেবে কিন্তু প্রাণপ্রিয় পার্কার আঙ্কেলকে না দেখলে তার চলবে না। আর মি. পার্কারও মনের অজান্তে যেন অপেক্ষা করে থাকেন ভাইঝির জন্য। মাসের শেষের উইকেন্ডটা তাই তার কাছে খুব আকাঙ্খিত।

ভি- ওয়ান খুব সাবধানী একজন প্রোগ্রামার। যদিও জটিল কোন দায়িত্বে সে নিয়োজিত নয়। শুধু পৃথিবীর মানুষগুলো কিভাবে বাড়ী ফিরবে সে কাজটুকুই দেখাশুনা করে। পৃথিবীতে মানুষগুলো স্পেস- টাইম ডাইমেনশানে আবদ্ধ। তাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বিশিষ্ট শরীর আছে, যা থ্রি ডাইমেনশানাল স্পেসে যথার্থ ভাবে খাপ খায়। তাই তাদের এই শরীরগুলোকে কর্মক্ষম রাখার জন্য আর স্বচ্ছন্দ্যে চলাফেরার জন্য সারা পৃথিবীতে থ্রি- ডি স্পেসের জাল বুনে দেয়া হয়েছে। ভি- ওয়ানের গুরু ট্রিসটিন এই ধারণার প্রবর্তক। তার মতে পৃথিবীর এই থ্রি - ডি স্পেসে সেই থাকতে পারবে যে তার শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে পৃথিবীতে অবস্থান করতে পারবে। এই ধরণের অবস্থাকে পৃথিবীতে ‘বেঁচে থাকা’ বলে। শরীর ও আত্মার সমন্বয় ঘটায় যে প্রাণশক্তি তার কিন্তু এতকিছুর প্রয়োজন হয় না। সে সময় এবং স্থানের উর্ধ্বে। কিছুতেই তার পরিবর্তন নেই। আবার ভি- ওয়ান, ট্রিসটিন এবং আরো অনেকে রয়েছে যাদের বৈশিষ্ট্য হল ওরা সর্বোচ্চ ৩৩ ডাইমেনশান পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৩৩ ডাইমেনশানে আবদ্ধ। পৃথিবীর মানুষরা ডাইমেনশানের দিক দিয়ে থ্রি ডাইমেনশানের বেশী নয় তাই ট্রিসটিনদের দেখতে পায়না। তাদের অস্তিত্বও অনুভব করতে পারেনা। অথচ এসকল মানুষদের ভাগ্য নির্ধারক হিসেবে ভি- ওয়ান কত খাটুনিই না করে। মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে করে মানুষদের সামনে এসে দাঁড়াতে। শরীর তো নেই তাই শরীরের আকার ধারণ করে কালো ছায়া হয়ে দৃশ্যমান হতে চেষ্টা করে সে, যাকে বলা যায় একদম শ্যাডো ম্যানের রূপে!ছায়া মানব। তর্ক বিতর্ক করেও পৃথিবীর মানুষগুলো তখন ওদেরকে দেখে ছায়া মানবের সংগা নির্ধারণ করতে পারে না। হায়রে মানুষগুলো, জানার স্তর ওদের কত কম! ভি- ওয়ান , ট্রিসটিন এসব কান্ড দেখে মিটিমিটি হাসে। ওরা আজ এসেছে পৃথিবী ভ্রমণে। বেশ দূর হতেই খেয়াল করছে নিগারকে। নিগার বাড়ী ফিরছে তার চিরচেনা পথ ধরে। ওদিকে মি. পার্কারও বাড়ি ফিরছেন। সারাদিনের কাজ শেষে আজ তিনি ভীষণ ক্লান্ত। আর চারদিন পরেই মাসের শেষ উইকএন্ড। তখন চাচা ভাতিজির দেখা হবে টরোন্টোতে। ভি- ওয়ান হঠাৎই ভাবলো, এমন করলে কেমন হয় যদি নিগারের কো- অর্ডিনেট টা হালকা টোকায় মি. পার্কারের কাছে নিয়ে আসা যায়! দুজনের মাঝে এখন ৩১৩ মাইল দূরত্ব। কাছাকাছি ওদের কো- অর্ডিনেট দুটো এনে ফেললে মি. পার্কার বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পাবেন যে নিগারও ফুটপাথ ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরছে। অথচ এখন টরোন্টোতে নিগার আসবেই বা কোথা থেকে , ও তো থাকে মন্ট্রিয়লে। চোখের ভুল মনে করে আপন মনে হয়তো বা তিনি হাসবেন। কিন্তু জানবেনও না যে তার দেখাটা আসলে ভুল ছিল না।

নিগারও দেখবে তার আংকেল পার্কারের সাদা ভ্যান গাড়িটির মত হুবুহু একটি গাড়ি তার ফুটপাথের পাশ দিয়ে চলে গেল। মনে মনে হাসবে নিগার। ভাববে তারও বুঝি চোখের ভুল। হয়তোবা তার একমাত্র প্রিয় আংকেলের কথা খুব মনে পড়ে বলেই যেখানে সেখানে আজকাল আংকেলের গাড়িটাও দেখতে শুরু করেছে।

প্ল্যানটা ভি- ওয়ান , ট্রিসটিনকে বললো। শুনে ট্রিসটিন বললো,

- চমৎকার আইডিয়া। কাজটা আমিই করবো। দুজনের কো- অর্ডিনেট একটু কাছাকাছি আনা, এই- ই তো?
- হ্যা, কিন্তু সাবধানে।

–এতে আবার কি সাবধানতা?
- দুজনকে কিন্তু পাশাপাশি রাখতে হবে। একজন যদি আরেকজনের কো-অর্ডিনেটের ওপর এসে পড়ে তাহলে কিন্তু সংঘর্ষ অনিবার্য।
- তেমন তো হয়েই থাকে। পথে যেতে যেতে কত মানুষ একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়, না?
- সে তো ভীড় থাকলে।
- ভীড় হয় কখন? অনেকগুলো কো- অর্ডিনেট কাছাকাছি চলে এলেই তো?
- কিন্তু এখানে ব্যাপারটা জটিল।
- কেমন জটিল?
- যেমন ধর, দুজনেই তো হাঁটছে না। নিগার যাচ্ছে ফুটপাথ দিয়ে। আর মি. পার্কার যাচ্ছেন ভ্যান চালিয়ে। সামান্য ভুলে কিন্তু সংঘর্ষ বাঁধবে। আর তা থেকে কি হবে বুঝতে পারছো তো? অ্যাকসিডেন্ট।
- তা হবে না। আমি ওদের কো- অর্ডিনেট দুটো একটু কাছাকাছি করবো এই যা। এখনি করি না কেন?
- এখন কেন? পরেও করা যাবে। এখন চল ঘুরে বেড়াই। দেখি এই পৃথিবীর ছোট্ট ছোট্ট মানুষগুলো কে কোথায় কি করছে। ঢাকায় একট জায়গা আছে নাম শনির আখড়া। প্রায়ই বাস ট্রাক আর মিনিবাসে অ্যাকসিডেন্ট হয়। চলো ঘুরে আসি।
যে কথা সে কাজ। ওরা চলে এলো ঢাকায় । লক্ষ্য করলো জায়গাটার পরিবর্তন। একটা ডিভাইডার দেয়া হয়েছে অ্যাকসিডেন্ট প্রতিরোধের জন্য। কিন্তু ট্রিসটিনের প্রশ্ন
- এতে কি কাজ হবে? অ্যাকসিডেন্ট কি প্রতিহত হবে? ওরা কি মূল কারণটা জানে না?
- না জানে না। আর জানলেও ওদের কিছু করার নেই।
- কেন বলতো?

- প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে মানব প্রজাতি এখনো বেশ পিছনে পড়ে আছে। গাণিতিক সমীকরণগুলোও সবসময় সমাধানে পারদর্শী নয়। মাত্র তারা ভাবতে শুরু করেছে তাদের জগত ছাড়া অন্য জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে। অথচ পুরো বিশ্লেষণ এখনো করতে পারেনি। তাই এখনো জানে না যে শনির আখড়া জায়গাটা সেই জায়গা যেখানে অন্য একটি সাত- ডাইমেনশান জগতের সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। তাই যে কোন গতিশীল বস্তুই যখন এ পথ দিয়ে ধাবিত হয় তখন ঐ সেভেন- ডি জগতের সাথে ধাক্কা খায়, আর সাথে সাথে হয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রণহীন । সুতরাং ওখানে অ্যাকসিডেন্ট ঘটবার মাত্রা এত বেশী। তাছাড়া মানুষ প্রজাতি থ্রি- ডির বেশী ডাইমেনশান দেখতেও পায় না , অনুভবও করতে পারেনা। তাই এসব ব্যাপারে ওদের ধারণা ও জ্ঞান খুব সীমিত।
- তাহলে? এর কি কোন সমাধান নেই?
- আছে।
- কি সেটা?
- সমাধান দুটো। একটি আমাদের হাতে । আমরা সেভেন- ডি কে একটু সরিয়ে দিলেই দুই জগতের ছেদবিন্দু হিসেবে পরিচিত ঐ শনির আখড়া শনি মুক্ত হবে। আরেকটা উপায় হলো আরো ৫০ বছর অপেক্ষা করা। অর্থাৎ ২০৬০ সালের দিকে পৃথিবীর মানুষগুলো গাণিতিক হিসাব নিকাষে আরেকটু এগিয়ে যাবে। প্রকৌশল বিদ্যায় ও উন্নতি লাভ করবে। নিজেদের ডাইমেনশান নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ওদের আশপাশের জগতগুলোর সাথে কোন সংঘাত ছাড়াই সহ অবস্থানে সক্ষম হবে। উদ্দেশ্য ভাল রেখে এগুলে পৃথিবী থেকে বেশীরভাগ দুর্ঘটনা প্রতিহত করতে পারবে। আমাদেরকে আর রাত দিন খাটা খাটনি করতে হবে না তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষণ নির্ধারিত করে দেয়ার জন্য। ওদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক ওরা নিজেরাই হতে পারবে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে ট্রিসটিন এক টোকায় নিগারের কো-অর্ডিনেট টা মি. পার্কেরের খুব কাছে এনে ফেললো। কিন্তু ওর জানা ছিল না যে নিগারের পথচলা মি. পার্কারের গতিপথের সমন্তরাল নয়। ও জানবেই বা কিভাবে। এসব কাজ তো আসলে ভি- ওয়ানের । ভি- ওয়ান উপস্থিত থাকলে এ ভুলটা হয়তো বা হতো না। কিন্তুই যা হবার তা তো হয়েই গেল। নিগার

ম্যাথ ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরবার পথ ঠিকই ধরেছিল। রাস্তা পেরুতে যাবে যখন এমন সময় দেখে চোখের সামনে বিশাল ভ্যান গাড়ি। কোন সাড়া নেই শব্দ নেই, হঠাৎই যেন গাড়িটার উদয়। কোথা হতে এলো, কেনই বা এলো। এই নির্জন রাস্তা ধরে কোথায় যাবে সে? কোন শব্দই তো পেল না। বিশাল গাড়িটার স্টিয়ারিং হুইলে বসা চালকের চোখ দুটোও বিস্ফারিত। একি! এমন খালি একটা রাস্তায় ছোট্ট একটা মেয়ে এলো কোথা হতে? ব্র্যাডফোর্ড প্লেইসে তো সে ছাড়া আজকাল আর কেউই থাকে না। প্রতিবেশীরাও নেই যে তাদের ছেলেমেয়েদের আনাগোনা থাকবে। তাহলে এই মেয়েটি কে যে কিনা এত নিশ্চিন্ত মনে রাস্তা পার হচ্ছে দিক বিদিক খেয়াল না করেই। রাস্তার লাল বাতিটাও তো খেয়াল করছে না। না কি ও দেখতেই পায় নি। হঠাৎই তাই জোরে ব্রেক কষে ভ্যান থামানোর চেষ্টা করলেন মি. পার্কার। ভ্যানের ধাক্কায় পথচারী মেয়েটি ছিটকে পড়েছে একটু দূরে। মি. পার্কার ড্রাইভিং সিট থেকে নামলেন। ভয়ে কাঁপছে তার শরীর। ত্রিশ বছরের চালক হিসেবে একটি ভুলও করেন নি তিনি একবারের জন্য। কিন্তু আজ কি হলো? কিভাবে হলো এ ভুল? তার পারদর্শীতার সকল গর্ব এক নিমেষেই যেন শেষ হয়ে গেল। পুলিশও চলে এসেছে এর মাঝে। মি. পার্কার এগিয়ে গেলেন শায়িত পথচারীর নিথর দেহটির কাছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ যে দেখতে হুবুহু তার ভাতিঝি নিগারের মত। নাকি নিগারকেই দেখছেন। কিন্তু ও এখানে আসবে কি করে? ও থাকে সুদূর মন্ট্রিয়লে। মাসের শেষের উইকেন্ডের আরো দিন চারেক বাকী। তারপর ও আসবে। তাহলে এ নিশ্চয়ই চোখের ভুল। আসলে নিগারকে খুব বেশী ভালবাসেন বলেই হয়তো বা সবার মাঝেই মি. পার্কার তাকে খুঁজে পান। আতঙ্কে বুঝি তাই পথচারী মেয়েটিকেও তার একমাত্র ভাইঝি ভেবে ভুল হচ্ছে। প্রচন্ড শকে তিনি নির্বাক। কিছুই ভাবতে পারছেন না। মাথাটা বড্ড ঘুরছে। দাঁড়াতেও পারছেন না। আশপ[আশের শব্দগুলো খুব ক্ষীণ হয়ে আসছে। পুলিশের লোকগুলো বলছে ওনাকে ধরো। অজ্ঞান হয়ে গেছে। নিয়ে চল ঐ কাছের ক্লিনিকে।

অনাকাংখিত এই ঘটনায় মি. পার্কার এর পর হতে দীর্ঘকাল যাবত মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। কথা বলেন না। নির্বাক চেয়ে থাকেন। ডাক্তার তাকে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা দিয়েছেন। বহুদিনের সহকর্মীরা আসেন ওনাকে দেখতে। সবার মাঝে উনি তার প্রিয় মুখটিকে খুঁজে বেড়ান। অপেক্ষা করেন তার আদরের ভাইঝি আসবে বলে। কিন্তু নিগার তো আসে না। তার প্রাণপ্রিয় ভাইঝি তো তাকে আসে না দেখতে । নিশ্চয়ই মাসের শেষের উইকেন্ডের এখনো কিছু দেরী। আর কিছুদিন পরেই হয়তো বা নিগার আসবে।

মন্ট্রিয়ল, কানাডা
১৫.০৩.২০০৯